Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

জিহাদের অপপ্রচার ও ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়া মাসুদা সাফা

রোলঃ 23090121078

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

জিহাদের অপপ্রচার ও ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়া মাসুদা সাফা
রোলঃ 23090121078

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ জিহাদের অপপ্রচার ও ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুমাইয়া মাসুদা সাফা, আইডিঃ 23090121078 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " জিহাদের অপপ্রচার ও ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

সাফা

(স্বাক্ষর)

সুমাইয়া মাসুদা সাফা

আইডিঃ 23090121078

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ইসলামে জিহাদ বিধান.....1

বিশ্বজয়ী লক্ষ্য.....4

অনুমতি দানের কারণ সমূহ.....6

অভিযান ও যুদ্ধ সমূহ.....7

জিহাদ ও হত্যা - (জিহাদ বিষয়ক অপপ্রচার).....48

ইসলামের ইতিহাসে জিহাদ ও সন্ত্রাস.....53

বাইবেলীয় জিহাদ বনাম ইসলামের জিহাদ - প্রথম অংশ.....54

বাইবেলীয় জিহাদ বনাম ইসলামের জিহাদ - দ্বিতীয়/শেষ অংশ.....58

অপপ্রচারের কারণ বিশ্লেষণ এবং প্রভাব.....69

গবেষণার সীমাবদ্ধতা, ভবিষ্যত নির্দেশনা এবং সুপারিশ.....70

ইসলামে জিহাদ বিধান

জিহাদ' অর্থ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। শারঈ পরিভাষায় 'জিহাদ' হ'ল সমাজে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর রাস্তায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা যার চূড়ান্ত রূপ। জিহাদের উদ্দেশ্য হ'ল মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বে ফিরিয়ে আনা এবং মানুষে মানুষে সাম্য ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

(ক) মাক্কী জীবনে কাফেরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি ছিল না। বলা হয়েছিল,

كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

'তোমরা হস্ত সংযত রাখ এবং ছালাত আদায় কর ও যাকাত প্রদান কর'... *(নিসা ৪/৭৭)* ।

এই নীতি সর্বদা প্রযোজ্য। যখন কুফরী শক্তি প্রবল হবে এবং ইসলামী শক্তি তার তুলনায় দুর্বল থাকবে।

(খ) অতঃপর দেশ থেকে বা গৃহ থেকে বিতাড়িত হওয়ার মত চূড়ান্ত যুলুমের অবস্থায় সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয় দ্বীন ও জীবন রক্ষার্থে। বলা হয়,

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ-

'যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হ'ল তাদেরকে, যারা আক্রান্ত হয়েছে। কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আর আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে (যুদ্ধ ছাড়াই) সাহায্য করতে সক্ষম' *(হাজ্জ ২২/৩৯)* ।

(গ) এ সময় কেবল যুদ্ধকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

'আর তোমরা লড়াই কর আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে, যারা লড়াই করে তোমাদের বিরুদ্ধে এবং এতে বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না' *(বাক্বারাহ ২/১৯০)* ।

অর্থাৎ স্রেফ পরকালীন স্বার্থেই জিহাদ হবে, দুনিয়াবী কোন স্বার্থে নয় এবং যারা যুদ্ধ করে কেবল তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করবে।

(ঘ) যুদ্ধকালে নির্দেশ দেওয়া হয়,

اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِى سَبِيلِ اللهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ اغْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا وَلاَ تَغْدِرُوا وَلاَ تُمَثِّلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ وَلاَ أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ

'তোমরা আল্লাহর নামে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর তাদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করে। যুদ্ধ কর, কিন্তু গণীমতের মালে খেয়ানত করো না। চুক্তি ভঙ্গ করো না। শত্রুর অঙ্গহানি করো না। শিশুদের ও উপাসনাকারীদের হত্যা করো না'।

(ঙ) অতঃপর কুফরী শক্তির সর্বব্যাপী হামলা থেকে দ্বীন ও জীবন রক্ষার্থে মৌলিক নির্দেশনা জারী করা হয়,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ

‘আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফেৎনার (কুফরীর) অবসান হয় এবং আনুগত্য স্রেফ আল্লাহর জন্য হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয়, তবে যালেমদের ব্যতীত অন্যদের প্রতি কোন প্রতিশোধ নেই’ *(বাক্বারাহ ২/১৯৩; আনফাল ৮/৩৯)* ।

(চ) সর্বক্ষেত্রে ও সর্বাবস্থায় ‘তাওহীদের ঝান্ডা উঁচু থাকবে ও শিরকের ঝান্ডা অবনমিত হবে’ মর্মে জিহাদের চিরন্তন নীতিমালা ঘোষণা করা হয়। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

‘এবং তিনি কাফেরদের (শিরকের) ঝান্ডা অবনত করে দিলেন ও আল্লাহর (তাওহীদের) ঝান্ডা সমুন্নত রাখলেন। বস্ত্ততঃ আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়’ *(তওবা ৯/৪০)* ।

(ছ) যারা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে মানুষের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং আল্লাহর দ্বীনকে ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়, সেইসব কাফের অপশক্তির বিরুদ্ধে ইসলামকে বিজয়ী করাই ছিল যুগে যুগে নবী ও রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্যও ছিল তাই। যেমন আল্লাহ বলেন,

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ- هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

‘তারা চায় তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর জ্যোতিকে নিভিয়ে দিতে। অথচ আল্লাহ স্বীয় জ্যোতিকে (ইসলামকে) পূর্ণতা দান করবেন। যদিও অবিশ্বাসীরা তা পসন্দ করে না’। ‘তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে। যাতে তিনি উক্ত দ্বীনকে সকল দ্বীনের উপরে বিজয়ী করতে পারেন। যদিও মুশরিকরা তা পসন্দ করে না’ *(ছফ ৬১/৮-৯; তওবাহ ৯/৩২)* ।

(জ) কোন মুসলিম যদি কুফরী শক্তির দোসর হিসাবে কাজ করে, তাহ’লে তার বিরুদ্ধে ‘কঠোর’ হবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

‘হে নবী! তুমি জিহাদ কর কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে এবং তাদের উপরে কঠোর হও। ওদের ঠিকানা হ’ল জাহান্নাম। আর কতইনা মন্দ ঠিকানা সেটি’ *(তওবা ৯/৭৩; তাহরীম ৬৬/৯)*। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ হবে অস্ত্রের দ্বারা এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ হবে যবান দ্বারা এবং অন্যান্য পন্থায় কঠোরতা অবলম্বনের দ্বারা’। মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে সকল নষ্টের মূল জেনেও রাসূল (ছাঃ) তাকে হত্যার নির্দেশ দেননি তার বাহ্যিক ইসলামের কারণে।

(ঝ) মুসলমানদের পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ। কোন কারণে যুদ্ধ লাগলে অন্যদের দায়িত্ব হবে উভয় পক্ষকে থামানো এবং তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়া’ *(হুজুরাত ৪৯/৯)*। নইলে বিরত থাকা। এ বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন,

يَمْنَعُنِى أَنَّ اللهَ حَرَّمَ دَمَ أَخِى

'আমাকে যুদ্ধ থেকে বিরত রেখেছে এ বিষয়টি যে, আল্লাহ আমার উপর আমার ভাইয়ের রক্ত হারাম করেছেন'। লোকেরা বলল, আল্লাহ কি বলেননি,

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ

'তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না ফিৎনা অবশিষ্ট থাকে এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়' *(বাক্বারাহ ২/১৯৩)*।

জবাবে তিনি বলেন,

قَاتَلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ، وَكَانَ الدِّينُ لِلّٰهِ، وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ، وَيَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللهِ

'আমরা যুদ্ধ করেছি যাতে ফিৎনা (শিরক ও কুফর) না থাকে এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। আর তোমরা যুদ্ধ করছ যাতে ফিৎনা (বিপর্যয়) সৃষ্টি হয় এবং দ্বীন আল্লাহ ব্যতীত অন্যের (শত্রুর) জন্য হয়ে যায়' *(বুখারী হা/৪৫১৩)*।

তিনি ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন,

هَلْ تَدْرِى مَا الْفِتْنَةُ؟ كَانَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ الدُّخُولُ عَلَيْهِمْ فِتْنَةً، وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ

'তুমি কি জানো ফিৎনা কি? মুহাম্মাদ (ছাঃ) যুদ্ধ করতেন মুশরিকদের বিরুদ্ধে। আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধটাই ছিল ফিৎনা। তোমাদের মত শাসন ক্ষমতা লাভের জন্য যুদ্ধ নয়' *(বুখারী হা/৪৬৫১, ৭০৯৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

سَتَكُونُ فِتَنٌ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِى ... وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ

'সত্বর তোমাদের মধ্যে ফিৎনাসমূহ সৃষ্টি হবে। তখন তোমাদের মধ্যেকার বসা ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির চাইতে উত্তম হবে এবং বসা ব্যক্তি হাঁটা ব্যক্তির চাইতে উত্তম হবে। আর হাঁটা ব্যক্তি দৌড়ানো ব্যক্তির চাইতে উত্তম হবে। যদি কেউ আশ্রয়স্থল বা বাঁচার কোন স্থান পায়, তবে সে যেন সেখানে গিয়ে আশ্রয় নেয়'।

ফিৎনার সময় করণীয় প্রসঙ্গে হযরত সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! যখন আমাকে হত্যার জন্য আমার ঘরে ঢুকে কেউ আমার দিকে হাত বাড়াবে, তখন আমি কি করব? জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন,

كُنْ كَابْنِ آدَمَ

'তুমি আদমের পুত্রের মত হও' (অর্থাৎ হাবীলের মত মৃত্যুকে বরণ কর)। অতঃপর আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) মায়েদাহ ২৮ আয়াতটি পাঠ করে শুনালেন'। যেখানে হত্যাকারী ক্বাবীলের বিরুদ্ধে হাবীলের উক্তি উদ্ধৃত করে আল্লাহ বলেন,

لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

‘যদি তুমি আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে তোমার হাত বাড়াও, তবুও আমি তোমাকে হত্যার জন্য আমার হাত বাড়াবো না। আমি বিশ্বপ্রভু আল্লাহকে ভয় করি’ *(মায়েদাহ ৫/২৮)* ।

আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, যখন তোমাদের কারু গৃহে ফেৎনা প্রবেশ করবে, তখন সে যেন আদমের দুই পুত্রের উত্তমটির মত হয় (فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَىْ آدَمَ)।

বিশ্বজয়ী লক্ষ্য

বিশ্বব্যাপী কুফরী শক্তিকে অবনত করে তাওহীদকে সমুন্নত করা ও মানুষকে শয়তানী শাসন ও যুলুমের শৃংখলমুক্ত করে আল্লাহর বিধানের অনুগত করাই হ’ল জিহাদের বিশ্বজয়ী লক্ষ্য। যদিও এটি কষ্টকর। কিন্তু এটি আল্লাহ মুসলমানের উপর ফরয করেছেন মানবতার মুক্তির জন্য এবং বিশ্বে শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য। আল্লাহ বলেন,

قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

‘তোমরা যুদ্ধ কর আহলে কিতাবদের মধ্যকার ঐসব লোকের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহ ও বিচার দিবসের উপর ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম করেনা ও সত্য দ্বীন (ইসলাম) কবুল করেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা বিনীত হয়ে করজোড়ে জিযিয়া প্রদান করে’ *(বাক্বারাহ ২/২৪৬; তওবাহ ৯/২৯)*।

অবশ্যই এ জিহাদ কেবল অস্ত্রশক্তি দিয়ে নয়। বরং তা হবে মূলতঃ দ্বীনের শক্তি দিয়ে। অর্থাৎ কুরআন-সুন্নাহ ও যুক্তিপূর্ণ দলীল দ্বারা আক্বীদা পরিবর্তনের মাধ্যমে। যাকে ‘চিন্তার যুদ্ধ’ (الْغَزْوُ الْفِكْرِىُّ) বলা হয়। আর এটাই হ’ল দ্রুত ও স্থায়ীভাবে কার্যকর। আর এর মাধ্যমেই আসে সর্বাত্মক সমাজ বিপ্লব। ইসলামী জিহাদের এটাই হ’ল চূড়ান্ত লক্ষ্য।

জিহাদ প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। জিহাদকে ইসলামের চূড়া (ذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ) বলা হয়েছে’।আর চূড়া না থাকলে ঘর থাকেনা। যে ব্যক্তি কুফরী আদর্শের সঙ্গে আপোষ করে এবং তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদের আকাংখাও হৃদয়ে পোষণ করে না, সে ব্যক্তি মুনাফেকী হালতে মৃত্যুবরণ করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ

‘যে ব্যক্তি মারা গেল, অথচ জিহাদ করল না। এমনকি জিহাদের কথা মনেও আনলো না, সে ব্যক্তি মুনাফেকীর একটি শাখার উপর মৃত্যুবরণ করল’।

সেকারণ জিহাদের গুরুত্ব সর্বাধিক। এতে যুদ্ধের ময়দানে এমনকি বিছানায় মরলেও সে শহীদ হবে’। জিহাদ ব্যতীত মুসলমান তার জান-মাল ও ইয্যত নিয়ে দুনিয়ায় সম্মানের সাথে বেঁচে থাকতে পারে না এবং আখেরাতেও মুক্তি পেতে পারে না।

বস্তুতঃ জিহাদ হয়ে থাকে সন্ত্রাস দমনের জন্য এবং সমাজে আল্লাহর বিধান কায়েমের মাধ্যমে শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য। আল্লাহ বলেন,

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

'আখিরাতের ঐ গৃহ আমরা প্রস্তুত করেছি তাদের জন্য, যারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য ও বিশৃংখলা কামনা করেনা। আর শুভ পরিণাম হ'ল আল্লাহভীরুদের জন্য' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৩)*।

বাস্তবিক পক্ষে জিহাদের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার চাবিকাঠি। যেখানে আল্লাহ বলেছেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ

'তোমরাই হ'লে শ্রেষ্ঠ জাতি। যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য। তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে ও অন্যায় কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখবে' *(আলে-ইমরান ৩/১১০)*।

বস্তুতঃ আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকার-এর দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই মুসলমান বিশ্বজয়ী শক্তিতে পরিণত হবে। যা তরবারীর জোরে নয় বরং প্রতিষ্ঠিত হবে তার অন্তর্নিহিত তাওহীদী চেতনার অজেয় শক্তির জোরে। একদিন যা পৃথিবীর সকল প্রান্তে মাটির ঘরে ও গরীবের পর্ণকুটিরেও প্রবেশ করবে। সম্মানিত ব্যক্তির ঘরে (ইসলাম কবুলের মাধ্যমে) সম্মানের সাথে অথবা অসম্মানিত ব্যক্তির ঘরে (জিযিয়া প্রদানের মাধ্যমে) অসম্মানের সাথে'।

অনুমতি দানের কারণ সমূহ

মদীনায় হিজরতের পর সশস্ত্র জিহাদের অনুমতি দানের কারণ ছিল তিনটি।-

(১) মুসলমানেরা ছিল মযলূম এবং হামলাকারীরা ছিল যালেম।

(২) মুহাজিরগণ ছিলেন নিজেদের জন্মস্থান ও আবাসভূমি থেকে বিতাড়িত এবং তাদের মাল-সম্পদ ছিল লুণ্ঠিত। তারা ছিলেন অপমানিত ও লাঞ্ছিত, স্রেফ তাওহীদী আক্বীদার কারণে। দুনিয়াবী কোন স্বার্থের কারণে নয় *(হজ্জ ২২/৪০)*।

(৩) মদীনা ও আশপাশের গোত্রসমূহের সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর সন্ধি চুক্তি ছিল। যাতে পরস্পরের ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছিল। এক্ষণে মুসলমান হওয়ার কারণে অথবা মুসলমানদের সহযোগী হওয়ার কারণে যদি তাদের উপরে হামলা করা হয়, তাহ'লে সন্ধিচুক্তি রক্ষার স্বার্থে তাদের জান-মালের হেফাযতের জন্য রাসূল (ছাঃ)-কে যালেমদের হামলা প্রতিরোধে এগিয়ে যাওয়াটা নৈতিক বাধ্যবাধকতা ছিল।

জিহাদের অনুমতি লাভের পর ১ম হিজরীর রামাযান মাস থেকে কুরায়েশদের হামলা প্রতিরোধে মদীনার বাইরে নিয়মিত সশস্ত্র টহল অভিযান সমূহ প্রেরিত হ'তে থাকে। অতঃপর ২য় হিজরীর রজব মাসে নাখলা যুদ্ধের পর বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে নিয়মিতভাবে জিহাদ ফরয করা হয় এবং উক্ত মর্মে সূরা বাক্বারাহ ১৯০-১৯৩ এবং সূরা মুহাম্মাদ ৪-৭ ও ২০ আয়াত সমূহ নাযিল হয়।

অভিযান ও যুদ্ধ সমূহ

যুদ্ধের অনুমতি সংক্রান্ত আয়াত নাযিলের পর কুরায়েশ বাহিনীর মুকাবিলার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনা থেকে মক্কা অভিমুখী রাস্তাগুলিতে নিয়মিত টহল অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় বাইরের বিভিন্ন গোত্রের সাথে তাঁর কৃত সন্ধি চুক্তিসমূহ খুবই ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়। যার এলাকাসমূহ মদীনা হ'তে মক্কার দিকে তিন মনযিল অর্থাৎ প্রায় পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এইসব অভিযানের যেগুলিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বয়ং অংশ গ্রহণ করতেন, সেগুলিকে 'গাযওয়াহ' (غَزْوَةٌ) এবং যেগুলিতে নিজে যেতেন না, বরং অন্যদের পাঠাতেন, সেগুলিকে সারিইয়াহ (سَرِيَّةٌ) বলা হয়। এইসব অভিযানে যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে বের হ'লেও বলতে গেলে কোনটাতেই যুদ্ধ হয়নি। তবে মক্কায় খবর হয়ে গিয়েছিল যে, কুরায়েশদের হুমকিতে মুহাজিরগণ ভীত নন, বরং তারা সদা প্রস্তুত।

উল্লেখ্য যে, সকল অভিযানেই পতাকা থাকতো সাদা রংয়ের এবং পতাকাবাহী সেনাপতি থাকতেন পৃথক ব্যক্তি। এক্ষণে এই সময়ের মধ্যে প্রেরিত অভিযান সমূহ বিবৃত হ'ল, যা নিম্নরূপ।-

১. সারিইয়া সায়ফুল বাহর (سرية سيف البحر) বা সমুদ্রোপকুলে প্রেরিত বাহিনী: ১ম হিজরী সনের রামাযান মাস (মার্চ ৬২৩ খৃ.)। হযরত হামযাহ বিন আব্দুল মুত্ত্বালিবের নেতৃত্বে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট এই মুহাজির বাহিনী প্রেরিত হয় সিরিয়া হ'তে আবু জাহলের নেতৃত্বে প্রত্যাবর্তনকারী ৩০০ সদস্যের কুরায়েশ কাফেলার গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য। উভয় বাহিনী মদীনা থেকে ২৫০ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে লোহিত সাগরের তীরবর্তী 'ঈছ' (العِيْص) নামক স্থানে মুখোমুখি হয়। কিন্তু জুহায়না গোত্রের নেতা মাজদী বিন আমর, যিনি ছিলেন উভয় দলের মিত্র, তাঁর কারণে যুদ্ধ হয়নি। এ যুদ্ধে পতাকা বাহক ছিলেন আবু মারছাদ আল-গানাভী (রাঃ)।

২. সারিইয়া রাবেগ (سرية رابغ) : ১ম হিজরীর শাওয়াল মাস। ওবায়দাহ ইবনুল হারেছ বিন মুত্ত্বালিব-এর নেতৃত্বে ৬০ জনের এই মুহাজির বাহিনী প্রেরিত হয়। মদীনা থেকে দক্ষিণে এবং জেদ্দা থেকে ১৪০ কি.মি. উত্তরে অবস্থিত 'রাবেগ' অঞ্চলটি বর্তমানে মক্কা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। এই অভিযানে রাবেগ উপত্যকায় আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে ২০০ জনের এক বাহিনীর মুখোমুখি হ'লে উভয় পক্ষে কিছু তীর নিক্ষেপ ব্যতীত তেমন কিছু ঘটেনি। তবে মাক্কী বাহিনী থেকে দু'জন দল ত্যাগ করে মুসলিম বাহিনীতে চলে আসেন। যারা গোপনে মুসলমান ছিলেন। যাদের একজন হ'লেন মিক্বদাদ বিন 'আমর এবং অন্যজন হ'লেন উৎবাহ বিন গাযওয়ান। এই যুদ্ধে হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াকক্বাছ (রাঃ) কাফেরদের প্রতি সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপ করেন। সেকারণ তিনি أَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِى سَبِيلِ اللهِ 'আরবদের মধ্যে আল্লাহর রাস্তায় প্রথম তীর নিক্ষেপকারী' হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। রাসূল (ছাঃ) তার জন্য দো'আ করেছিলেন, اللَّهُمَّ سَدِّدْ سَهْمَهُ وَأَجِبْ دَعْوَتَهُ 'হে

আল্লাহ! তুমি তার তীরকে লক্ষ্যভেদী কর এবং তার দো‘আ কবুল কর’। এ যুদ্ধের পতাকা বাহক ছিলেন মিসত্বাহ বিন আছাছাহ বিন মুত্ত্বালিব (রাঃ)।

৩. সারিইয়া খাররার (سرية الخرّار) : ১ম হিজরীর যুলক্বা‘দাহ মাস। সা‘দ বিন আবু ওয়াকক্বাছ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ২০ জনের এই মুহাজির দল প্রেরিত হয় কুরায়েশদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য। তারা জুহফার নিকটবর্তী ‘খাররার’ উপত্যকা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসেন। কেননা মক্কার কাফেলা এখান থেকে একদিন আগেই চলে গিয়েছিল। এ যুদ্ধের পতাকা বাহক ছিলেন মিক্বদাদ বিন ‘আমর (রাঃ)।

৪. গাযওয়া ওয়াদ্দান (غزوة ودّان أو الأبواء) : ২য় হিজরীর ছফর মাস (আগষ্ট ৬২৩ খৃঃ)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বপ্রথম এই অভিযানে নিজেই নেতৃত্ব দেন, যাতে ৭০ জন মুহাজির ছিলেন। মদীনা থেকে ২৫০ কি.মি. দক্ষিণে এই অভিযানে তিনি ১৫ দিন মদীনার বাইরে ছিলেন এবং যাওয়ার সময় খাযরাজ নেতা সা‘দ বিন ওবাদাহ (রাঃ)-কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করে যান। এই অভিযানেরও উদ্দেশ্য ছিল কুরায়েশ কাফেলার পথ রোধ করা। কিন্তু বাস্তবে তাদের দেখা মেলেনি। তবে এই সফরে লাভ হয় এই যে, তিনি স্থানীয় বনু যামরাহ (بَنُو ضَمْرَةَ) গোত্রের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদনে সমর্থ হন (ইবনু হিশাম ১/৫৯১)। এ যুদ্ধের পতাকা বাহক ছিলেন হামযা বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব (রাঃ)।

৫. গাযওয়া বুওয়াত্ব (غزوة بواط) : ২য় হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস (সেপ্টেম্বর ৬২৩ খৃঃ)। ২০০ ছাহাবীকে নিয়ে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) স্বয়ং এ অভিযানে বের হন। মদীনা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে ১০০ কি.মি. দূরে এটি অবস্থিত। উমাইয়া বিন খালাফের নেতৃত্বে ১০০ জনের কুরায়েশ কাফেলার গতিরোধ করাই ছিল এ অভিযানের উদ্দেশ্য। কিন্তু কোন সংঘর্ষ হয়নি। এই অভিযানে বের হওয়ার সময় তিনি আউস নেতা সা‘দ বিন মু‘আয (রাঃ)-কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করে যান। এ যুদ্ধের পতাকা বাহক ছিলেন সা‘দ বিন আবু ওয়াকক্বাছ (রাঃ)।

৬. গাযওয়া সাফওয়ান(غزوة سفوان) : একই মাসে মক্কার নেতা কুরয বিন জাবের আল-ফিহরী মদীনার চারণভূমি থেকে গবাদিপশু লুট করে নিয়ে গেলে ৭০ জন ছাহাবীকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং বদর প্রান্তরের কাছাকাছি সাফওয়ান উপত্যকা পর্যন্ত ধাওয়া করেন। কিন্তু লুটেরাদের ধরতে ব্যর্থ হন। এই অভিযানকে অনেকে গাযওয়া বদরে ঊলা (غَزْوَةُ بَدْرٍ الْأُولَى) বা বদরের প্রথম যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। এই সময় মদীনার আমীর ছিলেন যায়েদ বিন হারেছাহ (রাঃ)।

উল্লেখ্য যে, এটাই ছিল মদীনার উপকণ্ঠে কুরায়েশদের প্রথম হামলা। এ যুদ্ধের পতাকা বাহক ছিলেন আলী ইবনু আবু ত্বালিব (রাঃ)।

৭. গাযওয়া যুল-‘উশাইরাহ (غزوة ذى العُشيرة) : ২য় হিজরীর জুমাদাল ঊলা ও আখেরাহ মোতাবেক ৬২৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাস। ১৫০ বা ২০০ ছাহাবীর একটি দল নিয়ে

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি মূল্যবান রসদবাহী কুরায়েশ কাফেলার গতিরোধে বের হন। কিন্তু ইয়াম্বু‘-এর পার্শ্ববর্তী যুল-‘উশায়রা পর্যন্ত গিয়েও তাদের ধরতে ব্যর্থ হন। এ সময় মদীনার আমীর ছিলেন আবু সালামাহ (রাঃ)। আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে এই কুরায়েশ কাফেলাটি বহাল তবিয়তে মক্কায় ফিরে যায় এবং এর ফলেই বদর যুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরী হয়। এই অভিযানকালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বনু মুদলিজ ও তাদের মিত্রদের সাথে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করেন। এ যুদ্ধের পতাকা বাহক ছিলেন হামযা বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব (রাঃ)।

৮. সারিইয়া নাখলা (سرية نخلة) : ২য় হিজরীর রজব মাস (জানুয়ারী ৬২৪ খৃঃ)। আব্দুল্লাহ বিন জাহশের নেতৃত্বে ৮ বা ১২ জন মুহাজির ছাহাবীর একটি ক্ষুদ্র দল প্রেরিত হয়। এ যুদ্ধে প্রেরণের সময় রাসূল (ছাঃ) তার হাতে একটি পত্র দেন এবং বলেন, দু’দিন পথ চলার আগ পর্যন্ত যেন পত্রটি না খোলা হয়। দু’দিন চলার পর তিনি পত্র খোলেন এবং পাঠ করার পর সবাইকে বলেন, আমাদেরকে ত্বায়েফ ও মক্কার মধ্যবর্তী নাখলায় অবতরণ করতে বলা হয়েছে এবং সেখানে গিয়ে কুরায়েশ কাফেলার অপেক্ষায় থাকতে বলা হয়েছে। অতএব যিনি শহীদ হ’তে চান কেবল তিনিই আমার সাথে যাবেন। অথবা ইচ্ছা করলে ফিরে যাবেন। এ ব্যাপারে আমি কাউকে চাপ দিব না তবে আমি যেতে প্রস্তুত’। তখন সাথী মুহাজিরগণের সবাই তাঁর সঙ্গে থাকলেন, কেউই ফিরে আসলেন না। উক্ত মুহাজিরগণের মধ্যে ছিলেন আমীর আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ছাড়াও সা‘দ বিন আবু ওয়াকক্বাছ, আবু হুযায়ফা বিন উৎবা বিন রাবী‘আহ, উক্কাশা বিন মিহছান, উৎবা বিন গাযওয়ান, ওয়াক্বিদ বিন আব্দুল্লাহ, খালেদ বিন বুকাইর ও সোহায়েল বিন বায়যা’ প্রমুখ (ইবনু হিশাম ১/৬০১-০২)।

অতঃপর তাঁরা নাখলা উপত্যকায় পৌঁছে একটি কুরায়েশ কাফেলাকে আক্রমণ করেন ও তাদের নেতা আমর ইবনুল হাযরামীকে হত্যা করে দু’জন বন্দী সহ গণীমতের মাল নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। এটাই ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম গণীমত লাভ এবং প্রথম নিহত হওয়ার ঘটনা ও প্রথম দু’ব্যক্তি বন্দী হওয়ার ঘটনা। ঘটনাটি ঘটে রজব মাসের শেষ দিনে। কেননা তারা দেখলেন যদি আমরা যুদ্ধ না করি, তাহ’লে শত্রু পালিয়ে যায়। এমতাবস্থায় তারা যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেন। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বন্দীদের মুক্তি দেন ও নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের রক্তমূল্য দেন। এ সময় মুসলমানেরা হারাম মাসের বিধান লংঘন করেছে বলে মুশরিকদের রটনার জবাবে সূরা বাক্বারাহ ২১৭ আয়াতটি নাযিল হয়। তাতে বলা হয়,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ-

‘লোকেরা তোমাকে প্রশ্ন করছে নিষিদ্ধ মাস ও তার মধ্যে যুদ্ধ করা সম্পর্কে। তুমি বল, এ মাসে যুদ্ধ করা মহাপাপ। তবে আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করা ও তাঁর সাথে কুফরী করা এবং মাসজিদুল

হারামে প্রবেশে বাধা দেওয়া ও তার অধিবাসীদের বহিষ্কার করা আল্লাহর নিকটে আরও বড় পাপ। আর ফিৎনা (কুফরী) করা যুদ্ধ করার চাইতে বড় পাপ। বস্তুতঃ যদি তারা সক্ষম হয়, তবে তারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরাতে পারে। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বধর্ম ত্যাগ করবে, অতঃপর কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কর্ম নিষ্ফল হবে। তারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে এবং সেখানেই চিরকাল থাকবে' (বাক্বারাহ ২/২১৭)। অর্থাৎ মুসলমানদের এই কাজের তুলনায় মুশরিকদের অপকর্মসমূহ ছিল বহু গুণ বেশী অপরাধজনক। এই যুদ্ধে নিহতের বদলা নিতেই আবু জাহল বদরে যুদ্ধ করতে এসেছিল। এই অভিযান শেষে শা'বান মাসে মুসলমানদের উপরে জিহাদ ফরয হয় (বাক্বারাহ ২/১৯০-৯৩; মুহাম্মাদ ৪৭/৪-৭, ২০)।

১. ১. পরিচিতি ও প্রকরণ - জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস

জঙ্গি ও জঙ্গিবাদ শব্দদ্বয় ইংরেজি (militant, militancy) শব্দদ্বয়ের অনুবাদ। ইদানিং এগুলি আমাদের মধ্যে অতি পরিচিত ও অতিব্যবহৃত। শব্দগুলি কিছু দিন আগেও এত প্রচলিত ছিল না। আর আভিধানিক বা ব্যবহারিকভাবে এগুলি নিন্দনীয় বা খারাপ অর্থেও ব্যবহৃত হতো না। শাব্দিক বা রূপক ভাবে যোদ্ধা, সৈনিক বা যুদ্ধে ব্যবহৃত বস্তু বুঝাতে এ শব্দগুলি ব্যবহৃত হতো।
বৃটিশ ইন্ডিয়ার কমান্ডার ইন চিফকে 'জঙ্গিলাট' বলা হতো।[1]

শক্তিমত্ত বা উগ্র বুঝাতেও এ শব্দ ব্যবহার করা হয়। (Oxford Advanced Learner's Dictionary) -তে বলা হয়েছে: militant. adj. favouring the use of force or strong pressure to achieve one's aim. ...militant: n. militant person, esp. in politics. ‘‘মিলিট্যান্ট (জঙ্গি): যে ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শক্তি বা জোরালো প্রভাব ব্যবহার করা সমর্থন করে।....’’
Merriam-Wepster's Collegiate Dictionary --তে বলা হয়েছে: militant 1: engaged in warfare or combat: fighting. 2: aggressively active (as in a cause) অর্থাৎ: মিলিট্যান্ট (জঙ্গি): যুদ্ধ বা সম্মুখসমরে লিপ্ত ব্যক্তি, যুদ্ধরত। উগ্রভাবে সক্রিয়।’’ দ্বিতীয় অর্থটিকে আরো একটু ব্যাখ্যা করে মাইক্রোসফট এনকার্টা অভিধানে মিলিট্যান্ট বা জঙ্গি শব্দের অর্থে বলা হয়েছে: (aggressive: extremely active in the defense or support of a cause, often to the point of extremism): ‘‘আগ্রাসী, কোনো বিষয়ের পক্ষে বা সমর্থনে চরমভাবে সক্রিয়, যা প্রায়শ চরমপন্থা পর্যন্ত পৌঁছায়।’’

এ সকল অর্থ কোনোটিই সরাসরি বে-আইনী অপরাধ বুঝায় না। এ সকল অর্থে আমাদের দেশের সকল রাজনৈতিক, আদর্শিক, পেশাজীবি ও সামাজিক দলই ‘‘মিলিট্যান্ট’’ বা ‘‘জঙ্গি’’। কারণ সকলেই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শক্তি বা ‘প্রেসার’ প্রয়োগ পছন্দ করেন এবং সকলেই তাদের নিজেদের আদর্শ ও স্বার্থ রক্ষায় বা প্রতিষ্ঠায় ‘‘উগ্রভাবে সক্রিয়’’।

কিন্তু আমরা বর্তমানে ‘জঙ্গি’ বলতে বুঝি বে-আইনী সহিংসতা ও খুনখারাপি। এ অর্থে প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত পরিভাষা সন্ত্রাস (terrorism) । কিন্তু আমরা বাংলায় পত্র-পত্রিকা, বক্তৃতা-বিবৃতি ও লেখালেখি থেকে বুঝি যে, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও চরমপন্থার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যারা সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্র বা সর্বহারার রাজত্ব প্রতিষ্ঠার নামে উগ্রতা, অস্ত্রধারণ, সহিংসতা বা খুনখারাপিতে লিপ্ত হন তাদেরকে আমরা ‘‘চরমপন্থী’’ (extremist) বলি। আর যারা ইসলামের নামে বা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নামে উগ্রতা, অস্ত্রধারণ, সহিংসতা বা খুনখারাপিতে লিপ্ত তাদেরকে বলি ‘‘জঙ্গি’’। আর যারা প্রচলিত সাধারণ রাজনৈতিক দলের নামে বা কোনো দল, মতবাদ বা আদর্শের নাম না নিয়ে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য উগ্রতা, অস্ত্রধারণ, সহিংসতা বা খুনখারাপিতে লিপ্ত হয় তাদেরকে সন্ত্রাসী বলি।

এরূপ বিভাজন বা পার্থক্যের কোনো ভাষাগত বা তথ্যগত ভিত্তি আছে বলে জানা যায় না। বরং ইংরেজি ব্যবহার থেকে বুঝা যায় যে, militant/ militancy জঙ্গি বা জঙ্গিবাদ শব্দ সরাসরি ‘বে-আইনী কর্ম’ বা অপরাধ বুঝায় না। বরং বেআইনী বা আইনসম্মত যে কোনো প্রকারের উগ্রতা বুঝাতে (militant, militancy): জঙ্গি ও জঙ্গিবাদ শব্দদ্বয় ব্যবহার করা হয়। চরমপন্থা ও চরমপন্থী (extremism/extremist) শব্দদ্বয়ও সরাসরি অপরাধ বা বে আইনী কর্মকান্ড বুঝায় না। পক্ষান্তরে সন্ত্রাস (terrorism) শব্দটিই সরাসরি অপরাধ ও বে-আইনী কর্মকান্ড বুঝায়।

এভাবে আমরা দেখছি যে, ‘‘জঙ্গিবাদ’’ শব্দটি কোনোরূপ ভাষাগত ভিত্তি ছাড়াই ‘ইসলামের নামে সহিংসতা’ অর্থে ব্যবহার হচ্ছে। অথচ মূল ভাষাগত অর্থে ইসলামের নামে, অন্য কোনো ধর্মের নামে, ধর্মনিরপেক্ষতার নামে, গণতন্ত্রের নামে, সমাজতন্ত্রের নামে, অন্য যে কোনো মতবাদ, আদর্শ বা অধিকারের নামে উগ্রতার আশ্রয় গ্রহণকারী মানুষকে জঙ্গি বলা চলে এবং তার মতামতকে জঙ্গিবাদ বলা চলে। ইংরেজি ব্যবহার এটিই প্রমাণ করে।

বস্তুত জঙ্গিবাদ বলতে আমরা যা বুঝাচ্ছি ও বুঝছি সে অর্থটি প্রকাশের জন্য সঠিক শব্দ হলো সন্ত্রাস। সন্ত্রাস-এর সাধারণ পরিচয় দিয়ে সন্ত্রাস বিষয়ক আলোচনার শুরুতে এনসাইক্লোপিডীয়া ব্রিটানিকায় বলা হয়েছে: terrorism: the systematic use of violence to create a general climate of fear in a population and thereby to bring about a particular political objective: ‘‘সন্ত্রাস: নির্দিষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে

সমন্বিতভাবে সহিংসতার ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা।”

মার্কিন সরকারের ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফ. বি. আই) terrorism বা সন্ত্রাসের সংজ্ঞায় বলেছে: "the unlawful use of force and violence against persons or property to intimidate or coerce a government, the civilian population, or any segment thereof, in furtherance of political or social objectives: কোনো সরকার বা সাধারণ নাগরিকদেরকে ভয় দেখিয়ে রাজনৈতিক বা সামাজিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ব্যক্তি বা সম্পদের বিরুদ্ধে ক্ষমতা বা সহিংসতার বেআইনি ব্যবহার করা।”

এ সংজ্ঞায় কর্মের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। শক্তি, ক্ষমতা বা সহিংসতার ব্যবহার যদি বে-আইনী হয় তবে তা ‘সন্ত্রাস’ বলে গণ্য হবে। আর যদি তা ‘আইন-সম্মত’ হয় তবে তা ‘সন্ত্রাস’ বলে গণ্য হবে না। এখানে সমস্যা আইন ও বে-আইন নির্ণয় নিয়ে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশ ইরাকে ‘রাজনৈতিক পরিবর্তন’, ‘স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি আনয়ন’, ‘মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা’ ইত্যাদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সরকার ও জনগণের বিরুদ্ধে ‘শক্তি ও সহিংসতা’ ব্যবহার করেছে এবং করছে। এ ব্যবহারকে তারা ‘আইনসম্মত’ ও তাদের মৌলিক অধিকার ও দায়িত্ব বলে মনে করছেন। কাজেই তারা একে সন্ত্রাস বলে মানতে রাজি নন, যদিও বিশ্বের অনেক মানুষই একে সন্ত্রাস বলেই মনে করছেন। পক্ষান্তরে ইরাকের প্রতিরোধ যোদ্ধাগণ “বিদেশী দখলদাত্বি” মুক্ত হতে মার্কিন সেনাবাহিনী ও তাদের স্থানীয় সহযোগীদের বিরুদ্ধে “শক্তি ও সহিংসতা” ব্যবহার করছেন এবং আফগানস্থানে তালিবানগণ রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে আফগান সরকারের সেনাবাহিনী, কর্মকর্তা ও বিদেশী সৈন্যদের বিরুদ্ধে ‘শক্তি ও সহিংসতা’ ব্যবহার করছেন। তারা তাদের এ কর্মকে আইনসঙ্গত দায়িত্ব বলে মনে করেন, পক্ষান্তরে অন্যরা একে ‘সন্ত্রাস’ বলে গণ্য করছেন। এভাবে আমরা দেখছি যে, সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীকে চিহ্নিত করা কঠিন এবং এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ প্রায় অসম্ভব। এজন্য অন্য অনেক সমাজবিজ্ঞানী কর্মের উপর নির্ভর না করে আক্রান্তের উপর নির্ভর করে সন্ত্রাসকে সংজ্ঞায়িত করতে চেষ্টা করেছেন। তাদের ভাষায়: "terrorism is premeditated, politically motivated violence perpetrated against noncombatant targets রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে পূর্বপরিকল্পিতভাবে অযোদ্ধা লক্ষ্যের বিরুদ্ধে সহিংসতা সন্ত্রাস।”

মার্কিন সরকার এ সংজ্ঞা গ্রহণ করেছেন বলে এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ সংজ্ঞার দ্বারা সন্ত্রাস বা সন্ত্রাসী চিহ্নিত করাও বিতর্কিত হতে বাধ্য। নিরস্ত্র ফিলিস্তিনী যুবকগণ যখন সশস্ত্র ইসরায়েলী সৈন্যদের প্রতি ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করেন অথবা ফিলিস্তিনী

মুক্তিযোদ্ধাগণ যখন সশস্ত্র ইসরায়েলীয় সৈন্যদেরকে আক্রমন করেন, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাশ্চাত্য বিশ্ব তাকে সন্ত্রাস বলে আখ্যায়িত করে। অথচ 'অযোদ্ধা' নিরস্ত্র ফিলিস্তিনী শিশু ও নারীপুরুষদের প্রতি ইসরায়েলী সৈন্যদের গুলি ছোড়া, বোমা নিক্ষেপ ইত্যাদি কর্মকে তারা সন্ত্রাস বলে গণ্য করেন না। বরং আত্মরক্ষার স্বাভাবিক অধিকার বলে দাবি করেন।
ইরাকে প্রতিরোধ যোদ্ধা বা শিয়া-সুন্নি সংঘাতে লিপ্ত বিভিন্ন দল নিরস্ত্র অযোদ্ধা মানুষদের হত্যা করলে তাকে সকলেই সন্ত্রাস বলে গণ্য করেন। কিন্তু মার্কিন বাহিনী ফালুজা এবং অন্যান্য স্থানে অযোদ্ধা নিরস্ত্র মানুষদেরকে হত্যা করলে তাকে সন্ত্রাস বলে কখনোই স্বীকার করা হয় না।
এভাবে আমরা দেখছি যে, যেভাবেই সংজ্ঞায়িত করা হোক না কেন, কোনো মানুষ বা মানবগোষ্ঠীকে 'সন্ত্রাসী' বলে চিহ্নিত করা খুবই কঠিন। সর্বোপরি, যুগে যুগে সকল স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তি ও স্বাধীনতা আন্দোলনসহ বিভিন্ন জাতি, দল বা রাষ্ট্র এরূপ সহিংসতার ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের স্বাধীনতা, মুক্তি ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় করেছেন। আধুনিক ইতিহাসে আইরিশ রিপাবলিকান আর্মী, আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস, তামিল টাইগার, পূর্ব তিমুরের স্বাধীনতাকামী দলসমূহ ও অন্যান্য অনেক দল ও সংগঠন তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সন্ত্রাসী কর্মান্ডের আশ্রয় নিয়েছে ও নিচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে সকল রাষ্ট্র, এমনকি জাতিসংঘও এরূপ অনেক 'সন্ত্রাসী' কর্মকান্ড সমর্থন করেছে এবং সন্ত্রাসী সংগঠনগুলিকে সাহায্য করেছে। যেমন হিটলালের দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ফরাসীদের 'সন্ত্রাসী' ও 'সহিংস' প্রতিরোধ আন্দোলন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী সরকারের বিরুদ্ধে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের 'সহিংস' ও 'সন্ত্রাসী' প্রতিরোধ আন্দোলন।

আরো লক্ষণীয় যে, স্বাধীনতা আন্দোলন ও প্রতিরোধ যুদ্ধকে ''সন্ত্রাস'' বলে আখ্যায়িত করা স্বৈরাচার, দখলদার বা সাম্রাজ্যবাদীদের চিরচারিত নিয়ম। নেপালের মাওবাদীদেরকে সন্ত্রাসী তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। কিন্তু জনগণ তাদেরকেই পছন্দ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সর্বদা ''সন্ত্রাসী'' বলে আখ্যায়িত করেছে পাকিস্তান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। এ জন্য বলা হয়: "One man's terrorist is another man's freedom fighter" যুদ্ধের ক্ষেত্রেও উভয় পক্ষ প্রতিপক্ষের সৈন্য ও নাগরিকদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারে সচেষ্ট থাকে। তবে সন্ত্রাসের সাথে যুদ্ধের মৌলিক পার্থক্য হলো, সাধারণ যুদ্ধ ও গেরিলা যুদ্ধ উভয় ক্ষেত্রেই যোদ্ধারা মুলত যোদ্ধা বা যুদ্ধ বিষয়ক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করতে সচেষ্ট থাকে এবং সামরিক বিজয়ই লক্ষ্য থাকে। পক্ষান্তরে সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে সামরিক বিজয় উদ্দেশ্য থাকে না। এক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্যই হলো সামরিক অসামরিক নির্বিচারে সকল লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করে ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করা। "Terrorism proper is thus the systematic use of violence to generate fear, and thereby to achieve political

goals, when direct military victory is not possible. This has led some social scientists to refer to guerrilla warfare as the 'weapon of the weak' and terrorism as the 'weapon of the weakest'." এজন্য মূলত সন্ত্রাস হলো যেখানে সামরিক বিজয় সম্ভব নয় সেখানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সুশৃঙ্খলিতভাবে সহিংসতার ব্যবহারের মাধ্যমে ভীতি সঞ্চার করা। এজন্য কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানী বলেছেন যে, গেরিলা যুদ্ধ দুর্বলের অস্ত্র এবং সন্ত্রাস দুর্বলতমের অস্ত্র।

১. ১. ২. সন্ত্রাসের প্রকারভেদ

Terrorism বা সন্ত্রাসকে বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিন্যাস করার চেষ্টা করা হয়েছে। অনেকে সন্ত্রাসকে তিনভাগে ভাগ করেছেন:

(1) Revolutionary Terrorism

(2) Sub revolutionary Terrorism

(3) Establishment Terrorism

প্রথম প্রকার (Revolutionary Terrorism) সন্ত্রাস অর্থ সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটিয়ে সেখানে অন্য একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। ইটালীর রেড ব্রিগেড, জার্মানীর রেড আর্মি (বাদের মেইনহফ), বাস্ক বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপ (ইটিএ), পেরুর শাইনিং পাথ ইত্যাদি অগণিত উদাহরণ রয়েছে এ জাতীয় সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের। রাজনৈতিক ব্যবস্থার পূর্ণ বিলুপ্তি না ঘটিয়ে সহিংসতার মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমাসীনদের সরিয়ে আংশিক পরিবর্তনের জন্য যে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিচালনা করা হয় তাকে (Subrevolutionary Terrorism) বিপ্লবেতর সন্ত্রাস বলা হয়। অনেকে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী সরকারের বিরুদ্ধে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের কর্মকান্ডকে এর উদাহরণ হিসেবে পেশ করেন। আয়ারল্যান্ডের আই. আর. এ.-কেও এ পর্যায়ে ফেলা যায়।

রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত বা রাষ্ট্র পরিচালিত সন্ত্রাসকে (Establishment terrorism) প্রাতিষ্ঠানিক সন্ত্রাস বা (state or statesponsored terrorism) রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বলা হয়। অনেক সময় সরকার বা সরকারের কোনো সংস্থা তারই নাগরিকদের, অথবা সরকারের মধ্যকার কিছু মানুষদের বিরুদ্ধে অথবা অন্য দেশের সরকার বা নাগরিকদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। এ জাতীয় সন্ত্রাস খুবই ব্যাপক, কিন্তু চিহ্নিত করা কঠিন। কারণ কোনো রাষ্ট্রই সাধারণত নিজের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড বা এ ধরনের কর্মকান্ডে তার সমর্থন প্রকাশ করে না বা স্বীকার করে না। শীতল যুদ্ধের সময়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও তার সমর্থক দেশগুলি বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে

অংশগ্রহণ বা সহযোগিতা করেছে। অনুরূপভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এঙ্গোলার (UNITA) বিদ্রোহীদের সমর্থন ও তাদের সাথে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অংশগ্রহণসহ সারা বিশ্বে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ বা সহযোগিতা করেছে এবং করছে।

১. ২. ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ

এভাবে আমরা দেখছি যে, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ছাড়া সাধারণভাবে সন্ত্রাস মূলত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এক প্রকারের যুদ্ধ। তবে যুদ্ধের সাথে এর পার্থক্য এ যে, যুদ্ধ রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের দাবিদার কর্তৃক পরিচালিত হয়, ফলে সেক্ষেত্রে ক্ষমতা ব্যবহারের বৈধতা বা আইনসিদ্ধতার দাবি করা হয়। এতে সাধারণত যোদ্ধাদেরকে লক্ষ্যবস্তু করা হয় এবং এর উদ্দেশ্য হয় সামরিক বিজয়। পক্ষান্তরে সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা দল রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী নয়। তবে তারা রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে চায়। এ জন্য তারা যোদ্ধাঅযোদ্ধা সবাইকে নির্বিচারে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতি করতে থাকে। যেন এক পর্যায়ে ভীত হয়ে সংশি-ষ্ট সরকার ও জনগণ অভিষ্ট 'রাজনৈতিক পরিবর্তন' করতে রাজি হয়। সাধারণভাবে যারা সম্মুখ বা গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের উপর সামরিক বিজয় লাভ করতে পারবে না বলে মনে করেন তারাই এরূপ সন্ত্রাসের আশ্রয় নেন।

এখন প্রশ্ন হলো, এরূপ সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের সাথে "ইসলাম"-এর সম্পর্ক কতটুকু? বর্তমানে আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যমে "ইসলাম"-কে সন্ত্রাসের জনক বলে চিত্রিত করা হচ্ছে। অথচ ইতিহাস ও বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সন্ত্রাস বলতে যা বুঝানো হয় তার শুরু হলো ইহূদী উগ্রবাদীদের দ্বারা। প্রাচীন যুগ থেকে ইহূদী উগ্রবাদী ধার্মিকগণ 'ধর্মীয় আদর্শ' ও 'ধর্মীয় রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার জন্য সন্ত্রাসের আশ্রয় নিয়েছেন। মানব ইতিহাসে প্রাচীন যুগের প্রথম প্রসিদ্ধ সন্ত্রাসী কর্ম ছিল উগ্রপন্থী ইহূদী যীলটদের (Zealots) সন্ত্রাস। খৃস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী ও তার পরবর্তী সময়ে রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে বসবাসরত উগ্রবাদী এ সকল ইহূদীরা নিজেদের ধর্মীয় ও সামাজিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আপোসহীন ছিল। যে সকল ইহূদী রোমান রাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতা করত বা সহঅবস্থানের চিন্তা করত এরা তাদেরকে গুপ্ত হত্যা করত। এজন্য এরা সিকারী (the Sicarii: dagger men) বা ছুরি-মানব নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এরা প্রয়োজনে আত্মহত্যা করত কিন্তু প্রতিপক্ষের হাতে ধরা দিত না। এদের হত্যাকান্ডের মূল উদ্দেশ্য ছিল জনগণ ও প্রশাসনকে সন্ত্রস্ত করা। এজন্য তাদের টার্গেটকে প্রকাশ্য দিবালোকে বাজার, উপাসনালয়, উৎসবকেন্দ্র বা অনুরূপ জনসমাবেশের মধ্যে আক্রমন করে হত্যা করত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এ সকল হত্যাকান্ডের মাধ্যমে জনগণকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা এবং রোমান প্রশাসন ও তাদের 'দালালদেরকে' তাদের কর্মকান্ডের সংবাদ জানানোর ব্যবস্থা করা।

মধ্যযুগে খৃস্টানদের মধ্যে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে সন্ত্রাসের অগণিত ঘটনা আমরা দেখতে পাই। বিশেষত ধর্মীয় সংস্কার, পাল্টা-সংস্কার (the Reformation and the Counter-Reformation) -এর যুগে ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্টদের মধ্যে অগণিত যুদ্ধ ছাড়াও যুদ্ধ বহির্ভুত সন্ত্রাসের অনেক ঘটনা দেখা যায়। পক্ষান্তরে ইসলামের ইতিহাসে আমরা যুদ্ধ দেখতে পেলেও সন্ত্রাস খুবই কম দেখতে পাই। ইসলামের ইতিহাসে বিভিন্ন প্রকারের যুদ্ধ হয়েছে। যেমন মুসলিম রাষ্টের সাথে অমুসলিম রাষ্ট্রের, মুসলিম রাষ্টের সাথে মুসলিম রাষ্ট্রের, মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে বিদ্রোহীদের যুদ্ধ ইত্যাদি। কিন্তু ইসলামের ইতিহাসে মুসলিম সমাজে মুসলমানদের মধ্যে, অথবা অমুসলিমদের মধ্যে সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের মাধ্যমে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা বা অন্য কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের উদাহরণ খুবই কম। ইসলামের ইতিহাসের প্রচীন দু-একটি ঘটনার কথা আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করব। তার আগে আমরা বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করি। বর্তমানে কিছু মুসলিম বিভিন্ন দেশে অযোদ্ধা ও নিরীহ মানুষ হত্যা করছে বা সন্ত্রাসের আশ্রয় নিচ্ছে বলে শোনা যায়। এগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রমাণিত নয়। সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী ঘটনা আমেরিকার টুইন টাওয়ার ধ্বংস। বিন লাদেন বা তার বাহিনী তা করেছে বলে দাবি করে যুক্তরাষ্ট্র এ দাবির ভিত্তিতে আফগানিস্তানের ও ইরাকের লক্ষ লক্ষ নিরীহ নিরস্ত্র অযোদ্ধা নারী-পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনোভাবেই বিষয়টি প্রমাণ করতে পারেনি। উপরন্তু এ অভিযোগে আটক ব্যক্তিদের গুয়ান্তামো বে-তে সকল মানবাধিকার ও ন্যায় বিচারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে বর্বর অত্যাচারের মাধ্যমে স্বীকারোক্তি গ্রহণের চেষ্টা করা হচ্ছে।

বাহ্যত এদের বিরুদ্ধে মার্কিন জনগণ ও বিচারকদের সামনে পেশ করার মত গ্রহণযোগ্য কোনো প্রমাণ নেই বলেই এরূপ করা হচ্ছে। যে কোনো এনসাইক্লোপীডিয়া বা তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থে সন্ত্রাসের ইতিহাস পাঠ করুন। দেখবেন সন্ত্রাসের উৎপত্তি ও বিকাশে মুসলমানদের অবদান খুবই কম। আমরা দেখেছি যে, সন্ত্রাসের উৎপত্তি ইহূদী যীলটদের হাতে। আধুনিক ইতিহাসে ভারতে, ইউরোপে ও অন্যান্য দেশে অগণিত সন্ত্রাসী দল ও সন্ত্রাসী ঘটনা পাবেন। এদের প্রায় সকলেই ইহূদী, খৃস্টান, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। ভারতে, আমেরিকায় বা অন্যত্র কোনো সন্ত্রাসী ঘটনা হলেই প্রথমে মুসলিমদেরকে দায়ী করা হয় এবং প্রচার মাধ্যমে তা ফলাও করা হয়। পরবর্তী তদন্তে অনেক সময় এদের সম্পৃক্ততা প্রমাণ করা যায় না, অথবা প্রমাণিত হয় যে, অন্যরা তা করেছে। কিন্তু সাধারণত প্রচার মাধ্যমে তা ফলাও করা হয় না। এরপরও যদি মুসলিমদের নামে কথিত সন্ত্রাসী ঘটনাগুলিকে সত্য বলে মেনে নেওয়া হয় তবে তা বিশ্বের সকল সন্ত্রাসী ঘটনার কত পারসেন্ট? ১ বা ২ পারসেন্টও নয়।

এভাবে আমরা দেখছি যে, 'ইসলামী জঙ্গিবাদ', 'ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও হত্যা'র বিষয়ে যা কিছু বলা হয় তার অধিকাংশই ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার। এরূপ মিথ্যা প্রচারণার পাশাপাশি আমরা দেখছি যে, প্রকৃতই কিছু মুসলিম ইসলামের নামে, ইসলাম বা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নামে বা অন্যায়ের প্রতিবাদের নামে হত্যা বা ধ্বংসাত্মক কর্মে লিপ্ত হচ্ছে। সত্য ও মিথ্যা এ সকল সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের কারণ সম্পর্কে অনেক আলোচনা-পর্যালোচনাও আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা দেখছি যে, সারা বিশ্বে অমুসলিম ও মুসলিম গবেষক-বুদ্ধিজীবীগণ জঙ্গিবাদের যে সকল কারণ উল্লেখ করছেন সেগুলির অন্যতম: (১) ইসলাম, (২) ইসলামী শিক্ষা, (৩) ওহাবী মতবাদ ও (৪) পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্র।

১. ৩. আলোচিত প্রথম কারণ: ইসলাম

অনেক পাশ্চাত্য পন্ডিত জঙ্গিবাদের জন্য ইসলাম ধর্মকে দায়ী করেন। এদের মধ্যে কেউ মনে করেন, ইসলামে অনেক ভাল কথা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং ইসলামী সভ্যতার সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার সহ-অবস্থান সম্ভব। তবে ইসলামের মধ্যে ভাল বিষয়ের সাথে জিহাদ, ধর্মত্যাগ, বিধর্মীদের সাথে যুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ক কিছু উগ্র ও অসহিষ্ণু বিষয়ও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যেগুলি মানবাধিকার বা সভ্যতার সহঅবস্থান বা বিকাশের বিপক্ষে। এ সকল শিক্ষা থেকেই জঙ্গিবাদের জন্ম। এজন্য জঙ্গিবাদ দমনের জন্য ইসলামের 'ভাল শিক্ষাগুলির' প্রসংশা করতে হবে ও সেগুলির বিকাশ ঘটাতে হবে। পাশাপাশি উগ্র বা 'খারাপ' শিক্ষার বিস্তার রোধ করতে হবে। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে। এ থেকে 'উগ্রতা'-র উৎসাহ দিতে পারে এরূপ শিক্ষা বাদ দিতে হবে।

এভাবে মুসলিম সমাজগুলিতে 'মডারেট' মুসলিমদের উত্থান ঘটাতে পারলেই জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। অন্য অনেক পাশ্চাত্য পন্ডিত মনে করেন বা দাবি করেন যে, ইসলামের মূল শিক্ষাই ''জঙ্গি''। তাদের মতে, ইসলাম তার অনুসারীদের অসহিষ্ণুতা শিক্ষা দেয়। ইসলামে জিহাদের নামে অমুসলিমদেরকে হত্যা করার উদাত্ত আহবান জানানো হয়েছে। আর এর ফলেই মুসলিমদের মধ্যে জঙ্গিবাদের উত্থান। তাদের মতে ইসলামী সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বন্ধ করার একমাত্র উপায় ইসলাম ধর্মকে নির্মুল অথবা নিয়ন্ত্রণ করা। এরা দাবি করেন যে, ইসলামী সভ্যতার সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত আবশ্যম্ভাবী। একে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। বিশ্বব্যাপী জঙ্গিবাদের উত্থান 'সভ্যতার সংঘাত' তত্ত্বের সঠিকত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

ইহূদী-খৃস্টান ধর্মগুরু ও ধর্মীয় উগ্রবাদীরাই শুধু নয়, পাশ্চাত্যের অনেক ''ধর্মনিরপেক্ষ'' রাষ্ট্রনেতা বা রাজনৈতিক নেতাও বিশ্বাস করেন যে, ইসলাম ও সন্ত্রাস সমার্থক এবং ইসলামকে প্রতিরোধ

করাই সন্ত্রাসকে প্রতিরোধ করা। অনেকে চক্ষু লজ্জায় বা 'ডিপে-াম্যাটিক-রাজনৈতিক' প্রয়োজনে তা সরাসরি বলেন না। তারা বলেন না যে 'ইসলামের বিরুদ্ধে' যুদ্ধ করতে হবে, বরং বলেন, 'ইসলামী জঙ্গিবাদের' বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু অনেকেই মনের কথাটি বলে ফেলেন, তাঁরা 'ইসলামী জঙ্গিবাদের' বিরুদ্ধে নয়, বরং 'ইসলামের' বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে ডেনমার্কের রানী এক বিবৃতিতে বলেন:

We are being challenged by Islam these years- globally as well as locally. It is a challenge we have to take seriously... We have to show our opposition to Islam and we have to, at times, run the risk of having unflattering labels placed on us because there are some things for which we should display no tolerance.

"বর্তমান বছরগুলিতে আমরা আন্তর্জাতিকভাবে এবং স্থানীয়ভাবে ইসলামের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছি। এ চ্যালেঞ্জকে আমাদের কঠিনভাবে গ্রহণ করতে হবে। ইসলামের প্রতি আমাদের বিরোধিতা আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে হবে। প্রয়োজনে এজন্য আমাদেরকে অপ্রশংসনীয় বদনাম গ্রহণের ঝুঁকিও গ্রহণ করতে হবে। (ইসলামের প্রতি বিরোধিতা বা বিদ্বেষ প্রকাশের কারণে

সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী, বর্ণবাদী ইত্যাদি খারাপ বিশেষণে ভূষিত হওয়ার ঝুঁকিও মেনে নিতে হবে।) কারণ কিছু কিছু বিষয় আছে যে বিষয়ে আমাদের কোনো নমনীয়তা বা সহনশীলতা প্রদর্শন করা উচিত নয়। (ইসলাম অনুরূপ বিষয় যার প্রতি কোনোরূপ সহশীলতা প্রদর্শন করা যাবে না, যদিও তাতে আমাদেরকে উগ্র, মৌলবাদী বা অনুরূপ কিছু বলা হয়।)"!

এরা মনে করেন, মানব সভ্যতার সংরক্ষণের জন্য জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায়, শক্তির মাধ্যমে বিশ্বের সকল মুসলমানকে হত্যা করা, বন্দী করা, জোরপূর্বক খৃস্টান বানানো ও মুসলিম দেশগুলিকে সামরিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। বিশেষত, ইসলামী শিক্ষার বিস্তার রোধ করা।

বর্তমানে আমরা পত্রপত্রিকায় প্রতিনিয়তই দেখতে পাই যে, ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক 'ধর্মনিরপেক্ষ' (?) রাজনীতিবিদ তাদের দেশগুলিতে মসজিদ তৈরি নিষিদ্ধ করতে, মুসলিমদের নাগরিকত্ব প্রদান বন্ধ করতে বা বহিষ্কার করতে সরকারের নিকট প্রকাশ্যে দাবি দাওয়া তুলছেন। উপরন্তু এ সকল দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে তারা নির্বাচনে ভাল ভোটও লাভ করছেন। এছাড়া এরূপ অনেক পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষ (?) রাজনৈতিক নেতা দাবি করছেন যে, ইউরোপে বা আমেরিকায় যদি কোনো সন্ত্রাসী হামলা হয় তবে নিশ্চিত ধরে নিতে হবে যে, মুসলিম সন্ত্রাসীরাই তা করেছে এবং এর জবাবে ক্ষেপনাস্ত্রের মাধ্যমে মক্কা-মদীনা ধ্বংস করে দিতে হবে। আমেরিকার প্রসিদ্ধ ও প্রভাশালী চিন্তাবিদ ও লেখিকা অ্যান কালটার সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনের জন্য সকল মুসলিম দেশ দখল করে মুসলিমদেরকে জোরপূর্বক খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করার দাবি জানিয়ে লিখেন: "we

should invade their countries, kill their leaders and convert them to Christianity." ‘‘আমাদের উচিত তাদের দেশগুলি আক্রমন করা, তাদের নেতাদেরকে হত্যা করা এবং ধর্মান্তরিত করে তাদেরকে খৃস্টান বানানো।’’

এ সকল গবেষক-পন্ডিতকে হয়ত মুসলিমগণ ‘ইসলাম-বিদ্বেষী’ বলে মনে করতে পারেন, তবে এদের অনেকের ক্ষেত্রেই এরূপ মতপ্রকাশের জন্য বিদ্বেষের চেয়ে অজ্ঞতাই বড় কারণ। এরা দেখছেন যে, কোনো কোনো মুসলিম নির্বিচারে নিরপরাধ মানুষ হত্যা করছে এবং এজন্য তারা ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ কুরআনের উদ্ধৃতি পেশ করছে। কাজেই তাঁরা ধারণা করেন যে, কুরআন এরূপই শিক্ষা দিয়ে থাকে। এদের অনেকেই ইসলামের জিহাদ বিষয়ক কিছু নির্দেশ হয়ত পাঠ করেছেন, কিন্তু জিহাদের প্রকৃত অর্থ, শর্ত বা বিধানাবলি জানেন নি। এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিম ধর্ম-প্রচারক বা ধর্মগুরুদের প্রচারণামূলক বইপুস্তকই পাঠ করেছেন, ইসলামী জ্ঞানের সূত্রগুলি থেকে নিরপেক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করেননি। বিশেষত ইসলাম বিদ্বেষী অপপ্রচারের জোয়ারের মধ্যে নিরপেক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ বা যাচাই করা অনেকের জন্যই খুব কঠিন কর্ম। এজন্য প্রচলিত প্রচারের ভিত্তিতে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, জঙ্গিবাদের জন্য ইসলামই দায়ী এবং ইসলামকে নিয়ন্ত্রণ করাই এ সমস্যা দূরীকরণের একমাত্র উপায়।

মুসলমানের সন্ত্রাসের জন্য তার ধর্ম ইসলামকে অভিযুক্ত করার ক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়। বিশ্বের সর্বত্র ও সকল জাতির মধ্যেই সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটছে। অন্য কোনো ধর্মের সন্ত্রাসীর সন্ত্রাসের জন্য তার ধর্মকে কখনোই দায়ী করা হয় না। কিন্তু মুসলিমের সন্ত্রাসের জন্য ইসলামকে ঢালাওভাবে দায়ী করা হয়। আসাম, মনিপুর, মিজোরাম, বিহার, শ্রীলঙ্কা, আয়ারল্যান্ড, স্পেন, ফ্রান্স বা অন্য কোনো স্থানের হিন্দু, খৃস্টান, বৌদ্ধ, ক্যাথলিক, প্রটেসট্যান্ট বা অন্য ধর্মের সন্ত্রাসীদের বিষয়ে তাদের ধর্ম উল্লেখ করা হয় না বা ধর্মকে দায়ী করা হয় না। তাদের দেশ বা জাতির পরিচয় দিয়ে বলা হয় আইরিশ, তামিল, মনিপুরী, আসামীয়, বাস্ক, ইটালীয়, স্পেনীয় বা জার্মান সন্ত্রাসী। কিন্তু কোথাও কোনো মুসলিম এরূপ করলে তার ধর্মকে দায়ী করা হয়। বলা হয়, ফিলিপাইন, ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান বা কাশ্মীরের ইসলামী বা মুসলিম সন্ত্রাসী...। অথচ সকল ক্ষেত্রেই সন্ত্রাসের কারণ ও দাবী একই। সকলেই তাদের ধারণা অনুসারে অধিকার রক্ষার সাধারণ পথে ব্যর্থ হয়ে সন্ত্রাসের পথ ধরে এবং সকলেই সন্ত্রাসের বৈধতা ও অনুপ্রেরণার জন্য নিজেদের ধর্মের বাণী ও শিক্ষা ব্যবহার করে। শুধু ধর্মাবলম্বীদের সন্ত্রাসই নয়, একান্তই ধর্মের নামে ও ধর্মের জন্য হত্যা, গণহত্যা ও সন্ত্রাসের অগণিত ঘটনা রয়েছে, যেগুলিতে কখনোই ধর্মকে দায়ী করা হয় না, বরং সন্ত্রাসে লিপ্ত মানুষদেরকে দায়ী করা হয়। সামান্য একটি তালিকা দেখুন:

(১) ধর্মের নামে ও একান্তই ধর্মীয় প্রেরণায় ইউরোপের খৃস্টানগণ বিগত প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে চার্চের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় ও তত্ত্বাবধানে এবং কখনো কখনো খৃস্টান শাসকদের নির্দেশে বিভিন্নভাবে নিরস্ত্র সাধারণ ইহূদীদেরকে নির্যাতন ও হত্যা করেছেন। এর মধ্যে অনেক "গণহত্যা"র ঘটনা রয়েছে যেগুলিতে একসাথে হাজার হাজার ইহূদীকে হত্যা করা হয়। সর্বশেষ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯৩৯-১৯৪৫) হলোকস্ট (holocaust) এ প্রায় ৬ মিলিয়ন ইহূদী নারী, পুরুষ ও শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

(২) একান্ত ধর্মীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইউরোপের খৃস্টানগণ স্পেনে ও ক্রুসেড যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে হাজার হাজার অযোদ্ধা নিরস্ত্র মুসলিম নারী, পুরুষ ও শিশুকে চরম বর্বরতার সাথে হত্যা করেছে। এর মধ্যে অনেক গণহত্যার ঘটনা রয়েছে। সর্বশেষ ঘটনা বসনিয়ায় (Bosnia and Herzegovina) সার্ব খৃস্টানগণ কর্তৃক মুসলিম হত্যাযজ্ঞ। এ হত্যাযজ্ঞের অনেক ঘটনার মধ্যে অন্যতম স্রেব্রেনিসায় (Srebrenica) গণহত্যা। একান্তই ধর্মীয় প্রেরণায় এবং ধর্মীয় বিদ্বেষ ও জাতিগত প্রতিহিংসার ভিত্তিতে জাতিসঙ্ঘ ঘোষিত নিরাপদ আশ্রয়ে জাতিসঙ্ঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীর নাকের ডগায় ১৯৯৫ সালের জুলাই মাসে সার্ব খৃস্টানগণ স্রেব্রেনিসায় ৮,০০০ নিরস্ত্র অযোদ্ধা মুসলিম যুবক, কিশোর ও শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করে। সর্বোপরি এ গণহত্যার বিষয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রাথমিক ঠান্ডা প্রতিক্রিয়ার কারণ বোধহয় একমাত্র এ-ই যে, ঘাতকগণ ছিল খৃস্টান আর নিহতরা ছিল মুসলমান। এ বিষয়ে এনকার্টার (The Bosnian War Crimes Investigations) রিপোর্টে বলা হয়েছে: Although the ICTY's inquiry focuses on war crimes committed by the warring parties within Bosnia, it has also raised serious questions among human rights observers about the role of the United States and other Western powers. Specifically, did U.S. intelligence agencies have advance knowledge of the Bosnian Serb attack on Srebrenica and fail to warn the United Nations (UN) forces guarding the city? Why were the U.S. and other Western intelligence agencies slow in releasing evidence of Bosnian Serb war crimes during the nearly four-year-long conflict? And why have Western officials in charge of enforcing the peace accord failed to arrest the two men indicted by the ICTY for masterminding the Bosnian Serb campaign of ethnic cleansing—the organized program of mass murder, rape, and destruction of homes and places of worship? "যদিও আই.সি.টি.ওয়াই (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia) -এর তদন্ত মূলত বসনিয়ার যুদ্ধরত পক্ষগুলির যুদ্ধপরাধ উদ্ঘাটনের

জন্য, তা সত্ত্বেও এ ট্রাইবুনাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য শক্তির ভূমিকা সম্পর্কে মানবাধিকার পর্যবেক্ষকদের মধ্যে গুরুতর কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। বিশেষত, স্রেব্রেনিসায় সার্বদের আক্রমন সম্পর্কে অগ্রিম কোনো তথ্য কি মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলির কাছে ছিল? তা সত্ত্বেও কি তারা এ শহর রক্ষায় নিয়োজিত জাতিসঙ্ঘ বাহিনীকে সে তথ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছিল? প্রায় চার বছর দীর্ঘ সংঘাতের সময়ে বোসনিয়ায় সার্বদের যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক তথ্যপ্রমাণাদি প্রকাশ করতে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থাগুলি এমন ধীরতা অবলম্বন করল কেন? যে সকল পশ্চিমা কর্মকর্তা শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের দায়িত্বে ছিলেন তারা এ গণহত্যা, গণধর্ষণ ও বাড়িঘর ও উপাসনালসমূহের ধ্বংসযজ্ঞের মূল পরিকল্পনাকারী নায়ক হিসেবে আইসিটিওয়াই যে দু ব্যক্তিকে চিহ্নিত করেছিল তাদেরকে গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হলেন কেন?"
(৩) ২০০২ সালে গুজরাট ও কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং পুলিশের প্রত্যক্ষ সহায়তা জঙ্গি হিন্দুরা প্রায় দুই হাজার মুসলিম নারী, পুরুষ ও শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করে, হাজার হাজার মুসলিম নারীকে ধর্ষণ করা হয় ও হাজার হাজার মুসলিম নাগরিকদের বাড়িঘর ও সম্পদ লুট করা হয়।

(৪) ধর্মভিত্তিক সন্ত্রাসের অন্যতম ঘটনা আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির সন্ত্রাসী কর্মকান্ড। বৃট্রিশদের সাথে আইরিশদের শত্রুতা ও বিরোধিতার মূল উৎস ধর্ম। বৃটিশগণ প্রটেস্ট্যান্ট ও আইরিশগণ ক্যাথলিক। ইউরোপের ইতিহাসে প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যকার ভয়ঙ্কর যুদ্ধগুলি ছাড়াও অনেক গণহত্যার ঘটনা সুপরিচিত। তারই অংশ হিসেবে এ দু দেশের মানুষের মধ্যে শতশত বছরের পুঞ্জিভুত বিদ্বেষের একটি প্রকাশ বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা লাভের জন্য সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে লিপ্ত হওয়া।
লক্ষণীয় যে, উত্তর আয়ারল্যান্ডের প্রটেস্ট্যান্টগণ সর্বদা বৃটিশ শাসনের পক্ষে থেকেছে আর আই. আর. এর সন্ত্রাস পরিচালিত হয়েছে অনেক সময় এ সকল আইরিশ প্রটেস্ট্যান্টদের বিরুদ্ধে। বিশেষত ১৯৭০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত আইআরএর গুপ্তহত্যা, বোমা হামলা, গাড়ি বোমা, বাণিজ্যিক কেন্দ্রে বোমা বিস্ফোরণ ইত্যাদি সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে শতশত বেসামরিক নিরস্ত্র নারী, পুরুষ ও শিশু নিহত হয়েছেন এবং অগণিত মানুষ আহত হয়েছেন।

(৫) ধর্মভিত্তিক ও ধর্মীয় সন্ত্রাসের অন্যতম উদাহরণ যায়নবাদী ইহূদীদের সন্ত্রাস। ফিলিস্তিনে ইহূদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য এরা অগণিত সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়েছে। ধর্মের নামে ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সন্ত্রাস করে তারা অগণিত নিরস্ত্র মানুষ হত্য কারেছে এবং গণহত্যায় লিপ্ত হয়েছে। এ সকল সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মধ্যে ছিল মেনাহেম বেগিনের নেতৃত্বে কিং ডেভিড হোটেল উড়িয়ে দেওয়া ও দির ইয়াসিন নামক গ্রামের নিরস্ত্র নিরীহ মানুষদের গণহত্যা।

মেনাহেম বেগিনের নেতৃত্বে ২২ জুলাই ১৯৪৬ সালে জেরুজালেমের কিং ডেভিড হোটেলে বোমা হামলা চালিয়ে ইরগুন যাভি লিয়াম (the Irgun Zvai Le'umi: National Military Organization) নামক ইহূদী সন্ত্রাসী জঙ্গি সংগঠন নিরস্ত্র শিশু ও মহিলা সহ আরব, বৃটিশ ও ইহূদী শতাধিক নিরস্ত্র অযোদ্ধা মানুষকে হত্যা করে এবং আরো অনেক মানুষ আহত হয়। এনকার্টা এনসাইক্লোপীডিয়ার এ ঘটনাকে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ-জমকালো সন্ত্রাসী ঘটনা (The most spectacular terrorist incident) এবং বিংশ শতাব্দীর ভয়ঙ্করতম সন্ত্রাসী ঘটনা (the deadliest terrorist incidents of the 20th century) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ সন্ত্রাসী মেনাহেম বেগিন পরবর্তীকালে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী হয়েছে এবং তাকে শান্তি তে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়েছে।

দির ইয়াসিনের বর্বর হত্যাকান্ডের নিন্দাজ্ঞাপন করে আলবার্ট আইনস্টাইন এবং ১৮ জন বিশিষ্ট ইহূদী নিউইয়র্ক টাইমসে চিঠি লিখেন ৪ ডিসেম্বর ১৯৪৮। এ চিঠিতে তারা বলেন: "আরব গ্রাম দির ইয়াসিন-এ তাদের (মেনাহেম বেগিন ও তার দলের) আচরন এ পার্টির নির্মমতার এক হৃদয় বিদারক দৃষ্টান্ত। প্রধান সড়ক থেকে দূরে ইহূদী ভূমি বেষ্টিত এই গ্রামবাসী কোন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় নি বরং আরর গোষ্ঠীরা যারা এই গ্রামকে তাদের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল তাদের তারা তাড়িয়ে দিয়েছে। সন্ত্রাসী দল ৯ এপ্রিল এই শান্তিকামী গ্রামবাসীর উপর আক্রমন করে। এরা কোনোভাবেই যুদ্ধের প্রয়োজনে কোনো সামরিক লক্ষ্য ছিল না। এই হামলায় গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী (২৪০ জন) নিহত হন, এবং জেরুজালেমের রাস্তায় বন্দী হিসেবে হটিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের কয়েকজনকে বাঁচিয়ে রাখা হয়। ... সন্ত্রাসীরা এই বর্বরোচিত ঘটনার জন্য লজ্জিত হওয়া তো দূরের কথা, এই ন্যাক্কারজনক ঘটনায় তারা গর্ববোধ করে ও এটি ব্যাপকভাবে প্রচার করে এবং দেশে উপস্থিত সকল বিদেশী সংবাদ সংস্থাকে দির ইয়াসিন-এ তাদের কৃত ধ্বংসযজ্ঞ ও লাশের স্তুপ দেখার আমন্ত্রণ জানায়।"

এরূপ ধর্মভিত্তিক সন্ত্রাসের অগণিত উদাহরণ আমরা সমকালীন ইতিহাসে দেখতে পাই। এ সকল ঘটনাকে সন্ত্রাসী ও ন্যাক্কারজনক ঘটনা বলে অনেকে স্বীকার করেছেন ও করছেন। কিন্তু কখনোই এ সকল সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের জন্য সন্ত্রাসীদের ধর্মকে দায়ী করা হয় নি। যদিও এ সকল সন্ত্রাসী কর্ম একান্তই ধর্মীয় প্রেরণায়, ধর্মীয় বিদ্বেষে বা ধর্মগ্রন্থের বাণীকে ভিত্তি করে করা হয়েছে, তবুও কখনোই তাদের বিষয়ে খৃস্টান সন্ত্রাসী, ক্যাথলিক সন্ত্রাসী, প্রটেস্ট্যান্ট সন্ত্রাসী, অর্থোডক্স সন্ত্রাসী, হিন্দু সন্ত্রাসী, ইহূদী সন্ত্রাসী বা অনুরূপ কিছু বলা হয় না। বরং তাদের জাতি, গোষ্ঠী বা অন্যান্য পরিচয়কে তুলে ধরা হয়। সর্বোপরি কখনোই তাদের সন্ত্রাসী বা মানবতা বিরোধী কর্মকান্ডের জন্য তাদের ধর্মকে দায়ী করা হয় না।

সন্ত্রাস উদযাপনও করা হচ্ছে। ১৯৪৬ সালে কিং ডেভিড হোটেলের এ সন্ত্রাসী ঘটনার ৬০ বর্ষপূর্তি ইস্রাইলে ঘটা করে উদযাপন করা হয়। ২০০৬ এর জুলাই মাসে ইস্রায়েল রাষ্ট্র প্রশাসন ও জনগণ এ সন্ত্রাসী ঘটনার ৬০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে ''জয়ন্তী'' উৎসব পালন করে। এ বিষয়ে ভারতের জাতীয় দৈনিক 'দি হিন্দু'র ২৪/৭/২০০৬ তারিখের অনলাইন সংস্করণে ''সন্ত্রাস উদযাপন: ইসরাইলী স্টাইল (Celebrating Terror, Israeli-style) প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

অনেকেই এরূপ গণহত্যা ও সন্ত্রাস উদযাপনের নিন্দা করেছেন, কিন্তু কেউই এজন্য ইহূদী ধর্ম, ধর্মীয় শিক্ষা বা ধর্মগ্রন্থকে দায়ী করেননি। কিন্তু ইহূদী রাষ্ট্রের বর্বর সন্ত্রাস ও গণহত্যার প্রতিবাদে অন্য কোনো উপায় না পেয়ে যখন কোনো ফিলিস্তিনী সন্ত্রাসের পথ বেছে নেয় তখন তার সন্ত্রাসকে ''ইসলামী সন্ত্রাস'' ও তাকে ''মুসলিম সন্ত্রাসী'' বলে উল্লেখ করা হয়। উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখছি যে, জঙ্গিবাদ বা সন্ত্রাস সকল ধর্মের, দেশের ও মতাদর্শের মানুষদের মধ্যে বিরাজমান। এ বিষয়ে মুসলিমদের ''শেয়ার'' নিতান্তই সীমিত। আর ইহূদী, আইরিশ, জার্মান, সার্ব, তামিল, আসামীয়, মনিপুরি, নেপালী, তিববতী, চীনা, আমেরিকান ও অন্যান্য সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাসের জন্য যেমন ইহূদী, খৃস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্ম দায়ী নয়, তেমনি মুসলিমদের সন্ত্রাসের জন্য কখনোই তার ধর্ম দায়ী নয়। কারো অপরাধের জন্য তার ধর্মকে দায়ী করা শুধু অপরাধই নয়, বরং তা অপরাধীর পক্ষে জনমত তৈরি করে এবং অপরাধ দমন বাধাগ্রস্ত করে। আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদে তা আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

১. ৪. আলোচিত দ্বিতীয় কারণ: ইসলামী শিক্ষা (১-১৪ নম্বর কারন)

বিশ্বের ধার্মিক বা অধার্মিক কোনো মুসলিমই উপর্যুক্ত মতামত সঠিক বলে মানতে পারেন না। বরং তারা একে বাস্তবতা বিবর্জিত এবং বিদ্বেষমূলক মত বলে বিশ্বাস করেন। তাঁরা অনুভব করেন যে, যদি ইসলাম ধর্মই জঙ্গিবাদের জন্য দায়ী হতো তবে আমরা সকল মুসলিমই আমাদের মধ্যে জঙ্গিবাদের আগ্রহ বা প্রেরণা অনুভব করতাম। মুসলিম পরিবারে বা সমাজে লালিত পালিত সকল ধার্মিক বা অধার্মিক মুসলিমই ইসলাম সম্পর্কে কমবেশি কিছু শিক্ষা পরিবার, প্রতিষ্ঠান বা সমাজ থেকে পেয়েছেন। কিন্তু কখনোই তারা অমুসলিম বা অন্যান্য মতাবলম্বীদের প্রতি অসহিষ্ণুতার শিক্ষা পান নি। সকল মুসলিম সমাজেই মুসলিমগণ অমুসলিমদের সাথে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সাথে বসবাস করে আসছেন। কাজেই জঙ্গিবাদের জন্য ইসলাম কখনো দায়ী হতে পারে না। সমস্যা থাকলে অন্য কোথাও রয়েছে, ইসলামের মধ্যে নয়। তাঁরা অস্বীকার করেন না যে, কিছু মুসলিম সন্ত্রাসের সাথে জাড়িত।

তবে তারা কখনোই স্বীকার করেন না যে, তাদের ধর্ম তাদের সন্ত্রাসের জন্য দায়ী। বরং এ সকল সন্ত্রাসীর ব্যক্তিগত বিভ্রান্তি, মানসিক বিক্ষুব্ধতা, সামাজিক অনাচার বা অন্য কোনো কারণ এর পিছনে কার্যকর। এদের অনেকেই মনে করেন যে, জঙ্গিবাদের উত্থানের জন্য মূলত দায়ী ইসলামী শিক্ষা বা মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার। জঙ্গিবাদের বিস্তারে মাদ্রাসা শিক্ষার এ দায়িত্বের প্রকৃতি নির্ণয়ে এ সকল পন্ডিতের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আমরা আগেই দেখেছি যে, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অমুসলিম পান্ডিতগণও 'ইসলামী শিক্ষাকেই' মূলত জঙ্গিবাদের উত্থানের জন্য দায়ী করছেন। তবে 'দায়িত্বের' প্রকৃতি নির্ণয়ে তাদের মধ্যে এবং তাদের সাথে মুসলিম পন্ডিতদের বিভিন্নতা রয়েছে। কেউ মনে করছেন যেহেতু ইসলামের মধ্যেই জঙ্গিবাদের শিক্ষা রয়েছে, সেহেতু ইসলামী ধর্মতাত্ত্বিক শিক্ষার প্রসার মানেই জঙ্গিবাদের প্রসার। যত বেশি কুরআন, হাদীস, ফিক্হ ইত্যাদি ধর্মতাত্ত্বিক শিক্ষা প্রসার লাভ করবে, ততই বেশি 'জিহাদী' মনোভাব, অন্য ধর্ম ও মতের প্রতি অসহিষ্ণু মনোভাব ও মোল্লাতান্ত্রিক (theocratic) স্বৈরাচারী সরকার জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়ার মনোভাব প্রসার লাভ করবে। এজন্য ইসলামী শিক্ষা বা ইসলামের ধর্মতাত্ত্বিক শিক্ষার প্রসার রোধই জাঙ্গিবাদ দমনের প্রধান উপায়।

অন্য অনেকে মনে করেন যে, ইসলামের মধ্যে মূলত জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের কোনো স্থান নেই, তবে ইসলামী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান বা মাদ্রাসাগুলিতে ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। অথবা এগুলির পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী ইসলামকে জঙ্গিবাদী রূপদানের সহায়ক। অথবা ইসলামী আবেগের অপব্যবহার করে এ সকল প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষকদেরকে সহজেই জঙ্গিতে রূপান্তরিত করা যায়। কেউ মনে করছেন, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান সঠিকভাবেই ইসলামের শিক্ষা প্রদান করছে, তবে সম্ভবত শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে কিছু ত্রুটি রয়েছে, যে কারণে এগুলি জঙ্গিবাদের সাথে জড়িত হয়ে গিয়েছে। এদের মতে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারই জঙ্গিবাদ রোধের উপায়।

'ইসলামী জঙ্গিবাদের' জন্য 'ইসলাম'-কে দায়ী করলে যেমন মুসলিমগণ হতবাক, বিস্মিত, ব্যথিত বা উত্তেজিত হয়ে এরূপ মতকে বিদ্বেষমূলক বলে মনে করেন, ইসলামী শিক্ষা বা মাদ্রাসার সাথে জড়িত মানুষরাও এ দ্বিতীয় মতটির বিষয়ে একইরূপ বিস্ময়, ব্যথা বা উত্তেজনা অনুভব করেন। তাঁরা অনুভব করেন যে, যদি ইসলামী শিক্ষা বা মাদ্রাসা শিক্ষাই জঙ্গিবাদের জন্য দায়ী হতো তবে আমরা মাদ্রাসার সকল ছাত্র শিক্ষক আমাদের মধ্যে জঙ্গিবাদের আগ্রহ বা প্রেরণা অনুভব করতাম। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কখনোই তা নয়। সন্ত্রাস, হত্যা ও ধ্বংসের প্রতি সবচেয়ে বেশি ঘৃণা ও বিরোধিতা অনুভব করছেন এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে আসা আলিম, ইমাম ও পীর-মাশাইখ।

বিগত প্রায় আড়াই শত বৎসর ধরে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা উপমহাদেশে চালু রয়েছে এবং মূলত একই পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী অনুসরণ করে চলেছে। এছাড়া অনুরূপ পদ্ধতির অগণিত মাদ্রাসা মালয়েশিয়া ও অন্যান্য মুসলিম দেশে রয়েছে। এগুলি থেকে বের হয়ে আসা অগণিত মানুষ সমাজের বিভিন্ন স্তরে কাজ করেছেন। ইতিহাসের কোনো পর্যায়েই তাঁরা সন্ত্রাসের জন্ম দেন নি। তাঁরা অস্বীকার করেন না যে, কিছু মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষক এ অপরাধের সাথে জাড়িত। তবে তারা কখনোই বিশ্বাস করেন না যে, তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা-ব্যবস্থা তাদের এ অপরাধের জন্য দায়ী। বরং তা তাদের ব্যক্তিগত বিভ্রান্তি।

এ সকল মাদ্রাসাশিক্ষিত মানুষ উপযুক্ত পান্ডিত-বুদ্ধিজীবীদেরকে 'ইসলামীশিক্ষা বিদ্বেষী' বা 'মাদ্রাসা বিদ্বেষী' বলে মনে করে থাকেন। তবে আমার কাছে মনে হয় 'ইসলামী জঙ্গিবাদের' জন্য 'ইসলাম ধর্ম'-কে দায়ী করা এবং 'ইসলামী শিক্ষা'-কে দায়ী করা উভয় মতের পিছনে অজ্ঞতা একটি বড় কারণ। পাশ্চাত্য অমুসলিম পন্ডিতগণ যেমন কোনো কোনো মুসলিমকে সন্ত্রাসী কর্মে লিপ্ত দেখে সন্ত্রাসীর ধর্মকে দায়ী করছেন, তেমনি অনেকে কোনো কোনো মাদ্রাসা শিক্ষিতকে সন্ত্রাসে লিপ্ত দেখে সন্ত্রাসীর শিক্ষাকে দায়ী করছেন। এ সকল পন্ডিতের অনেকেই মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা, পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচী ও মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষকদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক কর্মকান্ডের সাথে পরিচিত নন। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকে তাঁরা জানতে পারেন যে, মাদ্রাসাগুলিতে জঙ্গিবাদীদের আখড়া এবং মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকগণ জঙ্গি কার্যক্রমে লিপ্ত। এথেকে তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ইসলামী শিক্ষা বা মাদ্রাসা শিক্ষাই মূলত জঙ্গিবাদের উত্থান ও বিস্তারের জন্য দায়ী। এ বিষয়ে আন্তরিক বক্তব্য দিয়ে একজন লিখেছেন:

"It is a fact that some of the Madrasha students have got involved with what is called 'Islamic' militancy.... Though Madrasha education may not be held responsible for these most unwanted activities, yet there are some loopholes and it is time to think about bringing Madrasha education into the mainstream".

''এ কথা বাস্তব সত্য যে, কতিপয় মাদ্রাসা ছাত্র তথাকথিত 'ইসলামী জঙ্গিবাদে' সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। যদিও মাদ্রাসা শিক্ষা সম্ভবত এ সকল অতীব নিন্দনীয় কর্মকান্ডের জন্য দায়ী নয়, তবুও মাদ্রাসা শিক্ষায় কিছু ফাঁকফোকর রয়েছে এবং মাদ্রাসা শিক্ষাকে মূলধারায় নিয়ে আসার চিন্তা করার এখনই সময়।''

নিঃসন্দেহে লেখক ''মাদ্রাসা-বিদ্বেষী'' নন। তাঁর আন্তরিকতা প্রশংশনীয়। তিনি বলছেন, কতিপয় মাদ্রাসা ছাত্রের ইসলামী জঙ্গিবাদে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা ''সম্ভবত'' দায়ী না হলেও

শিক্ষা ব্যবস্থার ফাঁকফোকর দায়ী। তিনি জানেন যে, ''কতিপয়'' মাদ্রাসা ছাত্রের পাশাপাশি ''অনেক অনেক'' স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রও ''তথাকাথিত ইসলামী জঙ্গিবাদের'' সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু লেখক এজন্য ''সাধারণ শিক্ষা'' ''সম্ভবত'' দায়ী না হলেও সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার ''ফাঁকফোকর''-কে দায়ী বলে অভিযোগ করছেন না। এর কারণ কী! সম্ভবত এর কারণ হলো মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে তার অজ্ঞতা। তিনি সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় লেখাপড়া শিখেছেন। তিনি জানেন যে, সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় 'জঙ্গিবাদ' শিক্ষা দেওয়া হয় না। কাজেই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যারা জঙ্গিবাদে জড়িত হচ্ছে তাদের অপকর্মের জন্য তাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে বা শিক্ষাব্যবস্থার ফাঁকফোকরকে দায়ী করার কোনো প্রশ্ন তার মনে আসে নি। কিন্তু তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে জানেন না। ''সম্ভবত'' তিনি মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের বিষয়ে সুধারণা পোষণ করেন। এজন্য তিনি মনে করেন যে, ''সম্ভবত'' এদের অন্যায়ের জন্য এদের শিক্ষাব্যবস্থা দায়ী নয়। তবে তিনি অনুমানের উপরেই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন যে, এখানে কিছু ফাঁকফোকর রয়েছে। আমরা বুঝতে পারি যে, কোনো অপরাধীর অপরাধের জন্য তার ধর্ম, শিক্ষা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পরিবার ইত্যাদি সাধারণত দায়ী হয় না। তদুপরি আমি এখানে নিম্নের বিষয়গুলি বিবেচনা করতে পাঠককে অনুরোধ করছি।

(১) আমাদের সমাজের লক্ষ লক্ষ দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা, কর্মচারী, রাজনীতিবিদ, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক সকলেই আমাদের দেশের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ও বিভিন্ন সুপরিচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত। এদের দুর্নীতির জন্য কেউই তাদের শিক্ষাব্যবস্থা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করেন না। কারণ তাদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে যারা প্রতিবাদ করেন তারাও একই শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত। তাঁরা ভাল করেই জানেন যে, জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় বা এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি শিক্ষা দেওয়া হয় না। কাজেই দুর্নীতিবাজের দুর্নীতির জন্য তার ব্যক্তিগত লোভ, সামাজিক অনাচার, আইনের শাসনের অনুপস্থিতি ইত্যাদিই দায়ী; তার শিক্ষা ব্যবস্থা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়। এজন্য কোনো অজ্ঞ বা 'মাদ্রাসা শিক্ষিত' মানুষ দুর্নীতির প্রসারের জন্য 'আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা' বা 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' দায়ী বলে মন্তব্য করলে বা ডাক্তারদের 'কসাইসুলভ আচরণের জন্য' মেডিকেল কলেজগুলি' দায়ী বলে মন্তব্য করলে শিক্ষিত মানুষেরা তাকে মুর্খ বা নির্বোধ বলেই মনে করবেন। (তবে কতিপয় মাদ্রাসা শিক্ষিত জঙ্গির জন্য মাদ্রাসা শিক্ষাকে দায়ী করাকে মুর্খতা বা নির্বুদ্ধিতা বলে গণ্য না করে প্রগতিশীলতা, প্রাজ্ঞতা ও বুদ্ধিজীবিতা বলে মনে করবেন তাদের অনেকেই।)

(২) অনুরূপভাবে আমাদের দেশের অনেকে 'সর্বহারার রাজত্বের' নামে সন্ত্রাসকর্মে লিপ্ত। এরা আমাদের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে শিক্ষা লাভ করেছেন। কিন্তু কেউই বলবেন না যে, এদের ঘৃণ্য কর্মের জন্য তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা সমাজতান্ত্রিক আদর্শ দায়ী।

(৩) ভারত, বাংলাদেশ ও বিশ্বের অন্যান্য অনেক দেশে অনেক মানুষ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন। আবার এদের পাশাপাশি অনেক দেশে অনেক মানুষ চরমপন্থা, সন্ত্রাস, হত্যা বা জঙ্গি কর্মকান্ডের মাধ্যমে একই আদর্শ বাস্তবায়নের চেষ্টা করছেন। তারা থানা, হাসপাতাল ইত্যাদি আক্রমন করছেন, হত্যা ও লুটতরাজ করছেন, বিভিন্ন জনপদ আক্রমন করে গণহত্যা বা গণ-লুটপাট করছেন। এ সকল ''মার্কবাদী'', ''মাওবাদী'', ''সমাজতন্ত্রী'' বা ''সাম্যবাদী''-দের অপরাধের জন্য কখনো কেউ তাদের ধর্ম বা আদর্শকে দায়ী করেন না। এমনকি এদের কর্মকান্ডে মূলধারার ''সাম্যবাদী'', ''সমাজতন্ত্রী'', ''মার্কবাদী'' বা ''মাওবাদী''-গণ লজ্জিত হন না বা তাদেরকে কেউ দায়ীও করেন না।

(৪) মানবাধিকার, গণতন্ত্র ইত্যাদি মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কিন প্রশাসন ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। এ যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানব সন্তান জীবন ও সম্পদ হারিয়েছেন। তারা নির্বিচার বোমা মেরে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষের 'গণহত্যাযজ্ঞে' লিপ্ত হয়েছেন এবং সম্পদ ধ্বংস করেছেন এবং এরপর কয়েকশত কুর্দীকে হত্যার অপরাধে তারা সাদ্দাম হোসেনের বিচার করছেন। ইরাকী, আরব, মুসলিম ও বিশ্বের যে কোনো দেশ ও ধর্মের শান্তিকামী মানুষের দৃষ্টিতে এ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস মানবতার বিরুদ্ধে কঠিনতম অপরাধ। এখানে একজন বিক্ষুদ্ধ ইরাকী, আরব বা মুসলমান এ অপরাধের জন্য 'খৃস্টধর্ম', 'গণতন্ত্র' বা 'আমেরিকান সভ্যতা'-কে দায়ী করে মন্তব্য করতে পারেন; কারণ প্রেসিডেন্ট বুশ ও তার সহকর্মীবৃন্দ 'বিশ্বাসী ও ধর্মপরায়ণ খৃস্টান, আমেরিকান সভ্যতার সন্তান ও গণতন্ত্রের ধারক-বাহক'। কিন্তু কোনো খৃস্টান, আমেরিকান, গণতন্ত্রপ্রেমিক বা কোনো একজন প্রাজ্ঞ পন্ডিত এ মতের সাথে একমত হবেন না। তারা একে অজ্ঞতা প্রসূত প্রলাপ বলেই মনে করবেন। কারণ তারা জানেন যে, খৃস্টধর্ম, গণতন্ত্র বা আমেরিকান সভ্যতা কোনোটির এরূপ হত্যাযজ্ঞ, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও লুটতরাজ শিক্ষা দেয় না বা সমর্থন করে না। মার্কিন প্রশাসন যা করছেন তা বর্তমান নেতৃবৃন্দের অন্যায়, এজন্য তাদের ধর্ম, আদর্শ বা সভ্যতা দায়ী নয়।

(৫) ইসলামী শিক্ষা বা মাদ্রাসা শিক্ষার বিষয়টিও একই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা লাভ করা মানুষদের দুর্নীতি বা সন্ত্রাসের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে দায়ী করলে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের সৎ ও নীতিবান ছাত্রদের কাছে তা পাগলামি বলে মনে হয়, তেমনিভাবে মাদ্রাসা শিক্ষিত কতিপয়

মানুষের সন্ত্রাসের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষাকে দায়ী করলেও মাদ্রসা শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে জড়িত সাধারণ মানুষদের কাছে পাগলামি বলেই মনে হয়।

(৬) বর্তমান সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের সম্পৃক্তির মূল বিষয়টিও বিবেচ্য। আমরা দেখেছি যে, সন্ত্রাসে লিপ্ত ব্যক্তি নিজের ধর্ম বা আদর্শকে ব্যবহার করেন। দেশপ্রেম ও গণতন্ত্রের নামে সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে মানুষের দেশপ্রেম ও গণতান্ত্রিক অনুভূতির অপব্যবহার করা হয়। এভাবেই আমেরিকার গণতন্ত্রপ্রেমিক ও মানবাধিকারবাদী মানুষেরা প্রেসিডেন্ট বুশকে ম্যান্ডেট দিয়েছেন আত্মরক্ষা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ইরাকের নিরীহ নিরপরাধ মানুষদের মধ্যে হত্যাযজ্ঞ চালানোর। স্বভাবতই ইসলামের নামে সন্ত্রাসে ইসলামী অনুভুতিকে ব্যবহার করা হয়েছে ও হচ্ছে। এতে কোনো কোনো ইসলামপ্রেমিক সরল মানুষ প্রতারিত হচ্ছেন। মাদ্রাসায় পড়া কোনো মানুষ এরূপ প্রতারণার শিকার হতে পারেন না এরূপ দাবি কেউই করেন না। বরং এটাই স্বাভাবিক যে, গণতন্ত্রের নামে সন্ত্রাসে যেমন গণতন্ত্র-প্রেমিকরা প্রতারিত হচ্ছেন, সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্রের নামে সন্ত্রাসে যেমন সাম্যবাদী বা সমাজতন্ত্রীর প্রতারিত হচ্ছেন, তেমনি ইসলামের নামে সন্ত্রাসে ইসলাম প্রেমিক মাদ্রাসা ছাত্ররা বেশি প্রতারিত হবে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এর বিপরীত। জঙ্গিরা হয়ত তাদের কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য নিজেরা কোনো 'মাদ্রাসা' বা 'মসজিদ' প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাগুলি বা মাদ্রাসা শিক্ষিত মানুষেরা দলে দলে এ সকল সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে যোগদান করেছেন। বাংলাদেশে 'ইসলামী সন্ত্রাস' নামক জঙ্গিবাদের সাথে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে অভিযুক্তদের মধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষিতের সংখ্যা খুবই কম, শতকরা ৫ ভাগও নয়, বাকী ৯৫ ভাগ সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার তথ্য থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতার উন্মেষ থেকে আজ পযন্ত জঙ্গি তৎপরতায় জড়িত থাকার অভিযোগে যেসকল মানুষ অভিযুক্ত হয়েছেন বা শাস্তি পেয়েছেন তাদের অধিকাংশই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত বা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া। ২৪১টি মামলায় আটক ৫০৬ জঙ্গির পরিচয় বিশে-ষণ করে মাত্র ৩/৪ শতাংশ মাদ্রাসায় পড়া বলে জানা যায়। ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও বিশ্বের অন্যান্য দেশে জঙ্গি কর্মকান্ডের অভিযোগে অভিযুক্তদের তালিকা দেখলেও আমরা একই সত্য অনুধাবন করি।

(৭) সংবাদ মাধ্যমের সংবাদ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বিষয়। এরূপ সংবাদ, গণমাধ্যমীয় গবেষণা-প্রবন্ধ ও পর্যালোচনার উপর নির্ভর করে আমেরিকার জনগণ নিশ্চিত বিশ্বাস করেছিল যে, সাদ্দাম হোসেনের কাছে গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র রয়েছে, যা আমেরিকার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য ভয়ঙ্কর হুমকি। আর এজন্যই তারা একবাক্যে প্রেসিডেন্ট বুশকে ইরাক যুদ্ধের অনুমতি

দিয়েছিলেন। আজ লক্ষ লক্ষ মানব সন্তানের রক্ত ঝরানো এবং অমূল্য মানবীয় সম্পদের ধ্বংসলীলার পরে সবাই জানতে পারলেন ও স্বীকার করলেন যে, এরূপ কোনো অস্ত্র কোনোকালেই সেখানে ছিল না। সংবাদ মাধ্যমের কারণেই এখনো সবাই জানলেন না যে, এরূপ অস্ত্র থাকলেও কোনো দিনই ইরাক আমেরিকার স্বাধীনতা বা নিরাপত্তার হুমকি হতে পারত না। শুধু ইসরায়েল রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষার জন্যই এ গণহত্যা। সংবাদ মাধ্যমের কারণেই এশিয়ার সুনামি মহা সংবাদে পরিণত হয়, কিন্তু ফালুজার গণহত্যা ও মহাধ্বংস কোনো সংবাদই হয় না।

এজন্য গণমাধ্যমের সংবাদ বা তথ্যের উপর নির্ভর করা তো দূরের কথা, সুপ্রশিক্ষিত 'ইন্টেলিজেন্সী'র সুনিশ্চিত রিপোর্টের উপর নির্ভর করাও কঠিন। এ সকল তথ্যের বাইরে বাস্তব অবস্থার দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের দেশের আনাচে কানাচে অগণিত মাদ্রাসা ছড়িয়ে রয়েছে। এ সকল মাদ্রাসার কর্মকান্ড সবকিছুই সকল মানুষের জন্য উন্মুক্ত। এগুলির ছাত্র শিক্ষক সকলেই সমাজের সাথে বিভিন্নভাবে জড়িয়ে রয়েছেন। এদের মধ্যে কোনো সন্ত্রাসীর অস্তিত্ব আমরা পাই না। মাদ্রাসা শিক্ষিত যে সকল মানুষ জঙ্গিবাদের সাথে জড়িত হয়েছেন বলে আমরা শুনতে পাচ্ছি তাদের আনুপাতিক হার স্কুল-শিক্ষিত মানুষদের চেয়ে অনেক অনেক কম।

কেউ বলতে পারেন যে, যদিও জঙ্গি কর্মকান্ডে সাধারণ শিক্ষিতদের সম্পৃক্ততা বেশি, তবে এরা মাদ্রাসা শিক্ষিতদের প্রচারণার শিকার। যদি সম্পৃক্তদের মধ্যে অন্তত ৫০% মাদ্রাসা শিক্ষিত হতো তাহলেও হয়ত বলা যেত যে, অবশিষ্ট ৫০% তাদের প্রচারণার শিকার। কিন্তু আমরা দেখছি যে, প্রকৃত অবস্থা তার বিপরীত। বস্তুত জঙ্গি কর্মকান্ডে লিপ্ত ৫% মাদ্রাসা শিক্ষিতই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ''মুফতী'' ও গুরুদের প্রচারণার শিকার। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে, সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত অনেক মানুষ ইসলামী গবেষণা ও কর্ম শুরু করে আবেগী ও ''বোমা-ফাটানো'' বৈপ-বিক তত্ত্ব আবিষ্কার করতে শুরু করেন। গতানুগতিক আলিমদেরকে এরা অযোগ্য, দালাল ও দুর্বল ঈমান বলে আখ্যায়িত করেন। তাদের ক্ষুরধার যুক্তি ও আধুনিক তথ্যসমৃদ্ধ বক্তব্য অনেক মাদ্রাসা শিক্ষিতকেও আকৃষ্ট করে। জঙ্গি কর্মকান্ডের পিছনে এদের অবদানই বেশি। সাধারণ শিক্ষিত ও মাদ্রাসা শিক্ষিত সকলেই এদের দ্বারা প্রভাবিত।

কুরআনের যে সকল আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে এরা মানুষদের প্রতারিত করে সেগুলির প্রকৃত অর্থ বা প্রেক্ষাপট কোনো কোনো মাদ্রাসা-শিক্ষিতের জানা থাকে এবং এরা এ সকল বিষয়ে আলিমদেরকে প্রশ্ন করতে চেষ্টা করে। এজন্য মাদ্রাসা-শিক্ষিতদের চেয়ে সাধারণ-শিক্ষিত বা

অশিক্ষিতদের প্রভাবিত ও প্রতারিত করা এদের জন্য সহজতর। এজন্যই জঙ্গি কর্মকান্ডে সাধারণ শিক্ষিত বা অশিক্ষিতদের সম্পৃক্তি বেশি।

বাংলাদেশে বিগত কয়েক বৎসরে জঙ্গিবাদ বিরোধী অনেক অভিযান চালানো হয়েছে। অনেক মানুষ আটক করা হয়েছে ও অনেক অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু কোনো প্রতিষ্ঠিত ও পরিচিত মাদ্রাসা থেকে অস্ত্র উদ্ধার বা গ্রেফতারের একটি রেকর্ডও নেই। ডাকাত বা সন্ত্রাসীরা সেনাবাহিনী বা পুলিশের পোশাক ব্যবহার করলে যেমন সেনাবাহিনী বা পুলিশবাহিনীকে দায়ী করা যায় না, তেমনি কোনো সন্ত্রাসী কোনো স্থানে মসজিদ বা মাদ্রাসা নামে কোনো একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে সেখানে অস্ত্র রাখলে বা মাদক ব্যবসা করলে সেজন্য মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে দায়ী করা যায় না। বিশেষত মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে জড়িতদের তো কোনোরূপ ক্ষমতা বা অধিকার নেই যে, মাদ্রাসা নামে যা কিছু প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে তা তদারকি করবেন।

(৮) জঙ্গিবাদের সাথে মাদ্রাসাকে সম্পৃক্ত করে যারা আমাদের দেশে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেন তাদের বড় দুর্বলতা বাছবিচার ছাড়াই পাশ্চাত্য বা বিদেশী পন্ডিতদের মতামত আওড়ান। প্রকৃত বিষয় হলো ''জঙ্গি'' তৈরির বিশেষ উদ্দেশ্যেই আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে অনেক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বস্তুত রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য পাকিস্তান সরকার সর্বদা ইসলামী অনুভূতির অপব্যবহার করেছে। কাশ্মির জিহাদ ও অন্যান্য ইস্যুতে সরকার, সেনাবাহিনী বা এগুলির অঙ্গসংস্থা অনেক আলিম ও মাদ্রাসাকে ব্যবহার করেছে। তাদেরকে অস্ত্র প্রদান করা হয়েছে এবং ময়দানে যুদ্ধ করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। স্বভাবতই এক্ষেত্রে জিহাদের প্রেরণা ব্যবহার করা হয়েছে। পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা দেখব যে, ইসলামে জিহাদ বৈধ হওয়ার একটি শর্ত হলো রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে জিহাদ পরিচালিত হওয়া। এজন্য স্বভাবতই মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকগণ এরূপ জিহাদে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। আর একবার যারা অস্ত্রের ভাষা আয়ত্ব করেন তার সবসময়েই অস্ত্রের ভাষায় কথা বলতে চান।

১৯৭৯ খৃস্টাব্দে আফগানিস্তানে সোভিয়েট আগ্রাসন ও আলিমদের নেতৃত্বে আফগান জনগণের প্রতিরোধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সুর্বণ সুযোগ এনে দেয়। আফগান প্রতিরোধ যোদ্ধাদেরকে অর্থ ও অস্ত্র দেওয়া ছাড়াও সারা বিশ্ব থেকে মুজাহিদ সংগ্রহ, অর্থায়ন ও অস্ত্রায়নের কাজ যুক্তরাষ্ট্র ভালভাবেই করে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, সৌদি আরব ও অন্যান্য দেশ থেকে ধার্মিক মানুষদের বা মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে আফগান যুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে এদের তত্ত্বাবধানে অনেক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। সমর্থনপুষ্ট এ সকল ''মুজাহিদ'' যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজনের পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে ''জঙ্গি'' বলে পরিগণিত হলেন।

যুক্তরাষ্ট্র যতদিন এদের মুজাহিদ, প্রতিরোধ-যোদ্ধা বা মুক্তিযোদ্ধা বলেছে ততদিন আমাদের বুদ্ধিজীবীরাও এদেরকে তাই বলেছেন। আবার যখন থেকে যুক্তরাষ্ট্র এদেরকে জঙ্গি বলতে শুরু করল আমাদের বুদ্ধিজীবীরাও তা বলতে শুরু করলেন। সর্বোপরি মার্কিনীদের তালে তালে সকল দেশের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে জঙ্গি তৎপরতার সাথে যুক্ত করলেন।

(৯) কেন ইউ-টার্ন করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সাথীরা? প্রথমত তাদের প্রয়োজন মিটে যাওয়ার কারণে। দ্বিতীয়ত তাদের পরবর্তী প্রয়োজন মেটানোর জন্য। তাদের প্রথম প্রয়োজন ছিল ভিয়েতনাম যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়া ও সোভিয়েট ইউনিয়নকে পরাজিত করা। ‘‘মুজাহিদ’’-দের মাধ্যমে সে প্রয়োজন মেটানোর পরে মুজাহিদরা জঙ্গিতে পরিণত হলেন। তাদের পরবর্তী প্রয়োজন ইসলামকে নিয়ন্ত্রণ করা। সোভিয়েট ইউনিয়ন, সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সর্বগ্রাসী প্রচারাভিযান ও যুদ্ধাভিযান চালিয়ে তার পতন ঘটানোর পরে যুক্তরাষ্ট্র ‘‘ইসলাম’’-কে ‘‘মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের’’ সবচেয়ে বড় শত্রু হিসেবে গণ্য করে। তবে সর্বদা সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের বক্তব্য অতি সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করেন। ‘‘ইসলাম সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের’’ প্রধন শত্রু একথা না বলে তারা বলেন ‘‘ইসলাম পাশ্চাত্য সভ্যতা, গণতন্ত্র বা মানবাধিকারের’’ প্রধান শত্রু, একসময় যেমন সমাজতন্ত্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন ছিল ‘‘পাশ্চাত্য সভ্যতা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের’’ অর্থাৎ ‘‘সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসানের’’ প্রধান শত্রু। তারা দেখলেন যে, ইসলামকে ‘দানব’-রূপে চিত্রিত করার জন্য তাদের তৈরি এ সকল ‘‘মুজাহিদ’’-কে জঙ্গিতে রূপান্তরি করা খুবই কার্যকর পদক্ষেপ।

(১০) যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে কোরিয়া, জার্মানী ও অন্যান্য দেশ দখল করে, সেদেশে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করে তথায়অবস্থানের ও আধিপত্য করার সুযোগ পেয়েছে ঠিক তেমনিভাবে ইরাক ও আফগানিস্তান দখল করে এ সকল দেশে গণতন্ত্র ও জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করে এ সকল দেশে তাদের অবস্থান ও আধিপত্য চিরস্থায়ী করতে পারবে বলে ধারণা করেছিল। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে নি। গণতন্ত্র, জাতীয় সরকার, আধুনিক জীবনযাত্রা, পাশ্চাত্য শিক্ষার সুযোগ ইত্যাদি কোনো কিছুর বিনিময়েই এ সকল দেশের জনগণ যুক্তরাষ্ট্রের ও তার সহযোগীদের অবস্থান ও আধিপত্য মেনে নিতে রাজি হচ্ছেন না। বাহ্যত এর একটিই কারণ; তা হলে ‘‘ইসলাম’’। ইসলামী অনুভূতি, স্বাতন্ত্র্যবোধ ও আবেগ বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত এ সকল দেশে এবং বিশ্বের অন্য কোনো মুসলিম দেশে সাম্রাজ্যবাদীদের অবস্থান ও আধিপত্য নিরাপদ নয়। আর ইসালামী বিশ্বাস, স্বাতন্ত্র্যবোধ ও আবেগ নির্মূল বা নিয়ন্ত্রণ করতে ‘‘মাদ্রাসা’’ শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের কোনো বিকল্প নেই।

(১১) সাম্রাজ্যবাদীরা খুব ভালভাবে লক্ষ্য করেছেন, যে কোনো দেশে তাদের আগ্রাসন ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে সবেচেয়ে বেশি সোচ্চার সাম্যবাদী বা ''বামপন্থী'' এবং ''ইসলামপন্থী''-গণ। আর ''ইসলামপন্থী''-দেরকে নির্মুল বা দুর্বল করতে ''জঙ্গিবাদ'' ও ''মাদ্রাসাশিক্ষা'' বিরোধী প্রচারণা অত্যন্ত কার্যকর। মাদ্রাসা শিক্ষায় ''জঙ্গি'' তৈরি না হলেও ''ধার্মিক মুসলিম'' তৈরি হয়। এরা আধিপত্য ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। ইরাক, ইরান, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান ও অন্যান্য সকল দেশের তেল, গ্যাস, খনিজসম্পদ ইত্যাদির ইজারা বা দখল নিতে এবং এ সকল দেশে আধিপত্য বিস্তার করতে প্রধান বাধা এ সকল ধার্মিক মানুষ। এদের আধিক্য তাদের উদ্দেশ্য সাধনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে এবং এদের দুর্বলতা ও স্বল্পতা তাদের উদ্দেশ্য পূরণের পথ খুলে দেবে। ধার্মিক মানুষদেরকে সাধারণ মানুষদের চোখে হেয় করতে এবং ধার্মিক মানুষ তৈরির পথ রোধ করতে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করার কোনো বিকল্প নেই। এজন্যই তারা জঙ্গিবাদের ধুয়া তুলে মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। যদিও তাদের জানা থাকার কথা যে, তাদের তৈরি মাদ্রাসাগুলি এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিতগণ ছাড়া কোনো মাদ্রাসা থেকে জঙ্গি তৈরি হয় না।

(১২) নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত যে কোনো গবেষণা প্রমাণ করবে যে, জঙ্গিবাদের সাথে এদেশের কওমী বা আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষিত মানুষদের সম্পৃক্তি খুবই কম। এছাড়া অন্যান্য সকল দুনীতি ও অপরাধের সাথে এদের সম্পৃক্তি একেবারেই কম। যৌতুক, মাদকতা, মাদক পাচার, চুরি-ডাকাতি, খুন-সন্ত্রাস ইত্যাদি সকল অপরাধে জড়িত মানুষদের বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে গবেষণা করলেই তা জানতে পারবেন। দেশের জনসংখ্যার মধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের আনুপাতিক হার সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান আমাদের জানা নেই। তবে গত কয়েক বৎসরের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ও দাখিল ও আলিম পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের আনুপাতিক হারের পাশাপাশি কওমী মাদ্রাসার ছাত্রদের যোগ করলে সাধারণভাবে অনুমান করা যায় যে, শিক্ষিত বা স্বাক্ষর মানুষদের মধ্যে কমবেশি ১৫% মানুষ মাদ্রাসা শিক্ষিত। কিন্তু উপরের যে কোনো অপরাধে জড়িতদের মধ্যে ২% বা ১% ভাগ মাদ্রাসা শিক্ষিত মানুষও পাওয়া যাবে না বলেই প্রতীয়মান হয়।

(১৩) মাদ্রাসা শিক্ষার ধর্মীয় ও নৈতিক ভিত্তির কারণে এ শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্যে দুর্নীতি, অপরাধ, মাদকতা, মাদক পাচার ও অন্যান্য সকল অপরাধের প্রতি ঘৃণা ও আপত্তি বিদ্যমান থাকে। এজন্য তাদের অধিকাংশ এ সকল অপরাধ থেকে দূরে থাকার পাশাপাশি এ সকল অপরাধ বিরোধী মানসিকতা তৈরিতে সহায়তা করেন। এ ছাড়া স্বভাবতই তারা অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, ব্যভিচার, জুয়া, মদ ইত্যাদির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন। যে কোনো দেশপ্রেমিক

নাগরিকের দৃষ্টিতে এগুলি দেশগড়ার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে যারা বাণিজ্যিক বা অন্য কোনো স্বার্থে এ সকল অপরাধ বা অনাচারের প্রসার কামনা করেন তাদের দৃষ্টিতে মাদ্রাসা শিক্ষিত মানুষেরা তাদের প্রধান বাধা।

(১৪) বস্তুত ইসলামী শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার সম্প্রসারণই জঙ্গি দমনের অন্যতম উপায়। কারণ সঠিক ইসলামী জ্ঞান থাকলে তাকে ইসলামের নামে বিভ্রান্ত করা সম্ভব হয় না। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুসারে যতগুলি ‘‘জঙ্গি’’ দলের তালিকা করা হয়েছে, যত ‘‘জঙ্গি’’ গ্রেফতার করা হয়েছে বা তালিকাভুক্ত করা হয়েছে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার দিকে একবার তাকলেই যে কেউ নিশ্চিত হবেন যে, এদের অধিকাংশই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত। উপরন্তু এদের অধিকাংশই মাদ্রাসা শিক্ষিত বা আলিমগণের ঘোর বিরোধী। তারা আলিমদেরকে দালাল, আপোষকামী ও অজ্ঞ বলে প্রচার করে এবং তাদের অনুসারীদেরকে আলিমদের সাথে মিশতে নিষেধ করে। শুধু তাদের মতের সাথে যে আলিমের মত মিলে যায় তার প্রশংসা করে। এদের ধর্মীয় আবেগের সাথে সঠিক ধর্মীয় জ্ঞান না থাকার কারণে এদের মধ্যে উগ্রতা জন্ম নিয়েছে বা বপন করা হয়েছে। এদের মধ্যে কিছু মানুষ রয়েছে যারা অল্প কিছুদিন মাদ্রাসায় পড়েছে। এদেরও আবেগ তৈরি হয়েছে, কিন্তু জ্ঞান অর্জিত হয় নি।

সঠিক ইসলামী জ্ঞান না থাকাই জঙ্গিবাদের ক্ষপ্পরে পড়ার মূল কারণ। বস্তুত ধর্মীয় অনুভূতি মানুষের জন্মগত সহজাত অনুভূতি। সন্তানের প্রতি স্নেহ, পিতামাতার প্রতি ভালবাসা, সম্পদের মোহ, আত্মপ্রেম ইত্যাদির মতই ধর্মীয় অনুভূতি মানুষের সহজাত অনুভূতি। এ সকল অনুভূতিকে নির্মূল করা যায় না। একে সঠিক খাতে প্রবাহিত করাই মানবতার কল্যাণের একমাত্র পথ। ইসলাম সম্পর্কে আবেগ ও ভালবাসার পাশাপাশি সঠিক জ্ঞান না থাকলে সহজেই একজন মানুষকে বিভ্রান্ত করা সম্ভব।

১. ৪. আলোচিত দ্বিতীয় কারণ: ইসলামী শিক্ষা (১৫-২১ নম্বর কারন)

(১৫) জঙ্গিবাদ আমাদের দেশের একটি সমস্যা। এর পাশাপাশি আমাদের সমস্যগুলির অন্যতম হলো, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, পারিবারিক বা সামাজিক সহিংসতা, যৌতুক, এসিড, দুর্নীতি, ধর্ষণ, অপহরণ, খুন-খারাবি, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, মাদকাসক্তি ইত্যাদি। কেবলমাত্র নীতিকথা বা বদলে যাওয়ার উৎসাহ দিয়ে এ সকল অপরাধ বা অবক্ষয় কখনোই রোধ করা যায় না। বস্তুত মমত্ববোধ, দায়িত্ববোধ ও নৈতিক অনুভূতির সাথে ‘‘ভয় ও লোভ’’-ই মানুষকে অপরাধ ও অবক্ষয় থেকে রক্ষা করতে পারে। প্রতিশোধের স্পৃহা, সম্পদ, ক্ষমতা বা শক্তির লোভ ও অনুরূপ পশুপ্রবৃত্তি মানুষকে দ্রুত ও নগদ স্বার্থ হাসিলের জন্য দুর্নীতি ও হিংস্রতায় উদ্বুদ্ধ করে। ভয় ও লোভই তার ‘‘নগদ’’ প্রাপ্তির স্পৃহা নিয়ন্ত্রণ করে। এ ভয় ও লোভের তিনটি পর্যায়: (১)

নিজের বিবেকের কাছে নন্দিত বা নিন্দিত হওয়ার ভয় ও লোভ। (২) সমাজ, রাষ্ট্র বা আইনের চোখে নিন্দিত, নন্দিত, তিরস্কৃত, পুরস্কৃত বা শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার আশা ও ভয়। (৩) আল্লাহর কাছে নিন্দিত, নন্দিত, তিরস্কৃত বা পুরস্কৃত হওয়ার আশা ও ভয়। এর মধ্যে তৃতীয় পর্যায়টিই প্রকৃতভাবে দুর্নীতি ও হিংস্রতা বন্ধ করতে পারে। কারণ, প্রত্যেকের পক্ষেই নিজের বিবেককে প্রবোধ দেওয়া সম্ভব। সকলেই জানে সমাজ, রাষ্ট্র বা আইনকে ফাঁকি দেওয়া যায় এবং এগুলির কাছে কোনো সঠিক মূল্যায়ন আশা করা যায় না। এজন্য প্রকৃত সততা তৈরি করতে আল্লাহর ভয় ও লোভ সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই। আল্লাহ সকল কর্মের পরিপূর্ণ পুরস্কার দিবেন এবং সকল অন্যায়ের শাস্তি দিবেন বলে অবচেতনের বিশ্বাস লাভের পর মানুষ যে কর্মটি আল্লাহর কাছে অন্যায় বলে নিশ্চিত জানতে পারে সে কাজ করতে পারে না এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে ভাল বলে প্রমাণিত কাজটি কোনো জাগতিক পুরস্কার বা প্রশংসার আগ্রহ ছাড়াই, বরং সকল প্রতিকুলতা সত্ত্বেও করার চেষ্টা করে। বিশেষত আমাদের দেশে যেখানে আইনকে ফাঁকি দেওয়া অনেক বেশি সহজ সেখানে একমাত্র আল্লাহর ভয়ই দুর্নীতি, অপরাধ ও অবক্ষয় রোধের একমাত্র রক্ষাকবজ। এজন্য নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রসারই এ সকল অপরাধ ও অবক্ষয় নিয়ন্ত্রণে সত্যিকার অবদান রাখতে পারে।

(১৬) জঙ্গিবাদ এবং মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী, আধিপত্যবাদী ও আর্ন্তজাতিক বেনিয়া বা বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদীরা কথা বলছেন। আবার দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দ ও জনগণও কথা বলছেন। তবে প্রত্যেকের কথা বলার প্রেক্ষাপট ভিন্ন। সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য এর মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জনশক্তির উদ্ভব রোধ করা এবং তাদের আগ্রাসন, তাদের বাণিজ্য, অশ্লীলতা ভিত্তিক পণ্য, মাদক পণ্য ইত্যাদির ব্যাপক প্রসার ও জাতীয় সম্পদের ইজারা-দখলের পথ উন্মুক্ত করা। এতে সংশি-ষ্ট দেশে অন্যান্য সমস্যা সৃষ্টি হলেও তাদের কোনো অসুবিধা নেই। পক্ষান্তরে দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দ, সমাজবিদ ও জনগণ কথা বলছেন জাতীয় প্রেক্ষপটে দেশের অন্যান্য সমস্যার সাথে এ কঠিন সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করে দেশের সামগ্রিক স্থিতি ও অগ্রগতি নিশ্চিত করতে।

(১৭) জাতীয় কল্যাণে জঙ্গিবাদ দমনের কথা বলছেন যারা তাদের বুঝতে হবে যে, জঙ্গিবাদের অযুহাতে মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে বা মাদ্রাসা-পড়া, স্কুল-পড়া বা কোথাও না পড়া বোরকাওয়ালী, টুপিওয়ালা, দাড়িওয়ালা, মসজিদগামী ধার্মিক কর্মকর্তা, কর্মচারী, ছাত্র, ছাত্রী বা সাধারণ নাগরিককে অপদস্ত করলে, ঘৃণা প্রকাশ করলে, তাদের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করলে বা তাদেরকে হয়রানি করলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পুরোপুরি লাভবান হলেও দেশ ও জাতি পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এতে জঙ্গিবাদ কমবে না, অন্যান্য অপরাধ ও দুর্নীতি বাড়বে এবং দেশ অভাবনীয় সংঘাত ও আল্লাহর গযবে নিপতিত হবে।

(১৮) এভাবে আমরা দেখছি যে, যারা জঙ্গিবাদের সাথে ইসলামী শিক্ষাকে সম্পৃক্ত করে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা বা মাদ্রাসা শিক্ষার সংকোচন দাবি করছেন এবং যারা জঙ্গিবাদের সাথে ইসলামকে সম্পৃক্ত করে ইসলামের সংকোচন বা মুসলমানদের জোরপূর্বক খৃস্টান করার দাবি করছেন তাদের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। তাদের কেউ না জেনে এবং কেউ জেনেশুনে বিশেষ উদ্দেশ্যে এরূপ দাবি করছেন।

(১৯) আমরা আরো দেখছি যে, মাদ্রাসা শিক্ষা বা ধর্মভিত্তিক শিক্ষা সংকোচন করলে তা জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণে কোনোরূপ অবদান রাখবে না, বরং তার প্রসারে অবদান রাখতে পারে। তবে এরূপ সংকোচন নিঃসন্দেহে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, পারিবারিক বা সামাজিক সহিংসতা, যৌতুক, এসিড, দুর্নীতি, ধর্ষণ, ব্যভিচার, এইডস, অপহরণ, খুন-খারাবি, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, মাদকাসক্তি ইত্যাদি অপরাধ ও অবক্ষয়ের প্রসারে অভাবনীয় অবদান রাখবে। আমরা জাতিগতভাবে এরূপ সংকোচনে লাভবান না হলেও আন্তর্জাতিক বেনিয়া চক্র তাদের মাদকদ্রব্য ও অশ্লীলতা-ভিত্তিক বহুমাত্রিক পণ্য বিপননের ক্ষেত্রে লাভবান হবে এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমাদের অবক্ষয় ও দুর্নীতির সুযোগে তাদের স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে।

(২০) এখানে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয় হলো, সমস্যার কারণ নির্ধারণে বিভ্রান্তি অনেক সময় সমস্যা উস্কে দিতে পারে। সন্ত্রাসের জন্য সন্ত্রাসীর জাতি, ধর্ম, গোত্র, দল বা শিক্ষাব্যবস্থাকে দায়ী করলে মূলত সন্ত্রাসীকে সাহায্য করা হয়। এতে একদিকে সন্ত্রাসীর স্বজাতি, স্বধর্ম, স্বদল বা স্বশিক্ষার মানুষেরা সন্ত্রাসের বিরোধিতার পরিবর্তে সন্ত্রাস বিরোধীদের সাথে বিরোধিতায় জড়িয়ে পড়েন, অপরদিকে পরোক্ষভাবে তাদের মধ্যে সন্ত্রাসীর প্রতি এক প্রকারের 'সহমর্মিতা' জন্মলাভ করে। আমরা দেখেছি যে, কোনো কোনো পাশ্চাত্য পন্ডিত সন্ত্রাসের জন্য ইসলামকে দায়ী বলে মন্তব্য করে ইসলামের সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাতকেই উস্কে দিচ্ছেন। সন্ত্রাসের জন্য ইসলামী শিক্ষাকে দায়ী করলেও একইভাবে সন্ত্রাসকে উস্কে দেওয়া হবে এবং সন্ত্রাসীদের জন্য সহমর্মী সৃষ্টি করা হবে। এছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষিত মানুষেরা সন্ত্রাস বিরোধিতার বদলে অপ্রাসঙ্গিক বির্তকে জাড়িয়ে পড়বেন। সর্বোপরি এরূপ মতামতের ভিত্তিতে যদি সরকার বা প্রশাসন মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ, সংকোচন বা মাদ্রাসার বিরুদ্ধে ঢালাও কোনো কর্মকান্ড হাতে নেন তবে তাতে নতুন এক প্রকারের সহিংসতায় আক্রান্ত হবে দেশ ও জাতি।

(২১) মূলত কোনো ধর্ম, মতবাদ বা আদর্শ সহিংসতা বা সন্ত্রাস শিক্ষা দেয় না। মানুষ মানবীয় লোভ, দুর্বলতা, অসহায়ত্ব, প্রতিশোধস্পৃহা ইত্যাদির কারণে সহিংসতা বা হিংস্রতায় লিপ্ত হয়। এরূপ সহিংসতায় লিপ্ত ব্যক্তি নিজের কর্মের পক্ষে সাফাই গাওয়ার জন্য, নিজের বিবেককে

অপরাধবোধ থেকে মুক্ত করার জন্য, অন্যকে নিজের পক্ষে টানার জন্য এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে নিজের আদর্শকে ব্যবহার করে। হাজার হাজার বছর ধরে বসবাসকারী আরবদেরকে জেরুজালেম ও অন্যান্য ফিলিস্তিনী এলাকা থেকে সন্ত্রাস ও গণহত্যার মাধ্যমে বিতাড়ন করে অন্যান্য দেশে হাজার বছর ধরে বসবাসকারী ইহূদীদেরকে সেখানে নিয়ে এসে ইস্রায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার জন্য ইহূদী-খৃস্টানগণ পবিত্র বাইবেলের বাণীকে ব্যবহার করেছেন। অনুরূপভাবে আইরিশ ক্যাথলিক ব্রিটিশ প্রটেস্ট্যান্টের বিরুদ্ধে নিজের ধর্মমতকে ব্যবহার করেন, তিববতীয় বৌদ্ধ চীনের বিরুদ্ধে নিজের বৌদ্ধ ধর্মমতকে ব্যবহার করেন, নিম্নবর্ণের হিন্দু উচ্চবর্ণের হিন্দুর বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক বা ধর্মীয় মতামত ব্যবহার করেন, নিম্নরর্ণের হিন্দুদের বিরুদ্ধে জঙ্গি ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালাতে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা বর্ণপ্রথা বিষয়ে বেদ, গীতা ও হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের শিক্ষা ও বাণীগুলিকে ব্যবহার করেন, ফিলিস্তিনী যোদ্ধা ইহূদী দখলদারের বিরুদ্ধে নিজের ইসলাম বা খৃস্টান ধর্ম থেকে উদ্দীপনা বা প্রেরণা লাভের চেষ্টা করেন। আমাদের সমাজে 'আওয়ামী লীগের' কর্মী যদি কোনো কারণে উত্তেজিত হয়ে সহিংসতায় লিপ্ত হন তবে তিনি 'স্বাধীনতা', 'বঙ্গবন্ধু', 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' ইত্যাদি মহান বিষয়কে তার কর্মের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। অনুরূপভাবে 'বিএনপি'র কর্মী এ ক্ষেত্রে 'শহীদ জিয়া', জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা ইত্যাদি মহান বিষয়কে নিজের 'এক্সকিউজ' হিসেবে ব্যবহার করেন। উভয় ক্ষেত্রেই দলের অন্যান্য বিচক্ষণ কর্মী জানেন যে, নিজের সহিংসতা বৈধ করার জন্যই এগুলি বলা হচ্ছে। সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষাকে দায়ী করে মাদ্রাসা শিক্ষা, মাদ্রাসা বা মাদ্রাসা শিক্ষিতদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিলে স্বভাবতই তারা ক্ষিপ্ত হয়ে সহিংসতায় লিপ্ত হবেন এবং 'ইসলাম' ও 'ইসলামী শিক্ষা'-র বিপন্নতাকে অজুহাত হিসেবে পেশ করবেন। এতে একমাত্র সন্ত্রাসীরাই লাভবান হবে এবং জাতি ভয়ঙ্কর সংঘাতের মধ্যে নিপতিত হবে।

১. ৫. আলোচিত তৃতীয় কারণ: ওহাবী মতবাদ

'ওহাবী মতবাদ'-কে জঙ্গিবাদের কারণ হিসেবে অনেক গবেষক উল্লেখ করছেন। সৌদি আরবের ধর্মীয় নেতা মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব (১৭০৩-১৭৯২ খৃ) প্রচারিত মতবাদকে 'ওহাবী' মতবাদ বলা হয়। তিনি তৎকালীন আরবে প্রচলিত কবর পুজা, কবরে সাজদা করা, কবরে বা গাছে সুতা বেঁধে রাখা, মানত করা ও অন্যান্য বিভিন্ন প্রকারের কুসংস্কার, শিরক, বিদ'আত ইত্যাদির প্রতিবাদ করেন। তাঁর বক্তব্য শুধু প্রতিবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। উপরন্তু তাঁর বিরোধীদের তিনি মুশরিক বলে অভিহিত করতেন। ১৭৪৫ খৃস্টাব্দে বর্তমান সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের অনতিদূরে অবস্থিত দিরইয়া্য নামক ছোট্ট গ্রাম-রাজ্যের শাসক আমীর মুহাম্মাদ ইবনু সাঊদ (মৃত্যু ১৭৬৫) তাঁর সাথে যোগ দেন। তাদের অনুসারীরা তাদের বিরোধীদেরকে মুশরিক বলে গণ্য করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালন শুরু করেন। ১৮০৪ সালের মধ্যে মক্কা-হিজায সহ আরব উপদ্বীপের অধিকাংশ 'সাউদী'- 'ওহাবী'দের অধীনে চলে আসে।

তৎকালীন তুর্কী খিলাফত এ নতুন রাজত্বকে তার আধিপত্য ও নেতৃত্বের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে মনে করেন। কারণ একদিকে মক্কা-মদীনা সহ ইসলামের প্রাণকেন্দ্র তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়, অন্যদিকে মূল আরবে স্বাধীন রাজ্যের উত্থান মুসলিম বিশ্বে তুর্কীদের একচ্ছত্র নেতৃত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য তুর্কী খলীফা দরবারের আলিমগণের মাধ্যমে ওহাবীদেরকে ধর্মদ্রোহী, কাফির ও ইসলামের অন্যতম শত্রু হিসেবে ফাতওয়া প্রচার করেন। মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র এদের বিরুদ্ধে জোরালো প্রচারাভিযান চালানো হয়, যেন কেউ এ নব্য রাজত্বকে ইসলামী খিলাফতের স্থলাভিষিক্ত মনে না করে। পাশাপাশি তিনি তুর্কী নিয়ন্ত্রণাধীন মিসরের শাসক মুহাম্মাদ আলীকে ওহাবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার নির্দেশ দেন। মিশরীয় বাহিনীর অভিযানের মুখে ১৮১৮ সালে সউদী রাজত্বের পতন ঘটে। এরপর সাউদী রাজবংশের উত্তর পুরুষেরা বারংবার নিজেদের রাজত্ব উদ্ধারের চেষ্টা করেন। সর্বশেষ এ বংশের 'আব্দুল আযীয ইবনু আব্দুর রাহমান আল-সাউদ (১৮৭৯-১৯৫৩) ১৯০১ থেকে ১৯২৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে বর্তমান 'সৌদি আরর' প্রতিষ্ঠা করেন।

খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে মুসলিম বিশ্বের যেখানেই সংস্কারমূলক কোনো দাওয়াত বা আহবান প্রচারিত হয়েছে, তাকেই সৌদি 'ওহাবীগণ' মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহাবের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত বলে দাবি করেছেন। অপরদিকে তুর্কী প্রচারণায় 'ওহাবী' শব্দটি মুসলিম সমাজে অত্যন্ত ঘৃণ্য শব্দে পরিণত হয়। তাদেরকে অন্যান্য বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের চেয়েও অধিকতর ঘৃণা করা হয়। ফলে বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকার বৃটিশ বিরোধী আলিমদেরকে ওহাবী বলে প্রচার করতেন; যেন সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে তাদের গ্রহণযোগ্যতা না থাকে। এছাড়া মুসলিম সমাজের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় একে অপরকে নিন্দা করার জন্য 'ওহাবী' শব্দের ব্যাপক ব্যাবহার করেন।

মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাবের সমসাময়িক ভারতীয় মুসলিম সংস্কারক শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (১৭০৩-১৭৬২ খৃ)। তাঁর মত-প্রচারের প্রথম দিকে ১৭৩১ খৃস্টাব্দে তিনি মক্কায় গমন করেন এবং তিন বৎসর তথায় অবস্থান করেন। এরপর দেশে ফিরে তিনি ভারতে ইসলামী শিক্ষা প্রসারে বিশেষ অবদান রাখেন। তিনিও কবর পূজা, পীর পূজা, কবরে মানত করা, কবরবাসী বা জীবিত পীর বা ওলীগণের কাছে বিপদমুক্তির সাহায্য চাওয়া ও অন্যান্য শিরক, বিদ'আত, কুসংস্কার, মাযহাবী বাড়াবাড়ি ইত্যাদির বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা ও প্রতিবাদ করেন। এজন্য কেউ কেউ তাঁকে 'ওহাবী' বলে চিহ্নিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। তবে ভারতের সর্বপ্রথম সংবিধিবদ্ধ ও সুপ্রসিদ্ধ 'ওহাবী' নেতা ছিলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহর পুত্র শাহ আব্দুল আযীযের (১৩৪৬-১৮২৩ খৃ) অন্যতম ছাত্র সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবী (১৭৮৬-১৮৩১ খৃ)। তিনি সমগ্র ভারতে মাযার, দরগা, ব্যক্তি পূজা, মৃত মানুষদের নামে মানত, শিন্নি ইত্যাদি বিভিন্ন শিরক, বিদ'আত ও

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচার করেন। এছাড়া তিনি বৃটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৮২১ খৃস্টাব্দে তিনি হজ্জে গমন করেন। প্রায় তিন বৎসর তথায় অবস্থানের পর তিনি ভারতে ফিরে আসেন।

১৮২৬ খৃস্টাব্দে তিনি বৃটিশ ভারত থেকে 'হিজরত' করে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গমন করে সেখানে 'ইসলামী রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন এবং নিজে সেই রাষ্ট্রের প্রধান হন। এরপর তাঁর নেতৃত্বে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলিম সেখানে একত্রিত হয়ে বৃটিশ ও শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। কয়েকটি যুদ্ধের পরে ১৮৩১ খৃস্টাব্দে বালাকোটের যুদ্ধে তাঁর বাহিনী পরাজিত হয় এবং তিনি শাহাদত বরণ করেন। পরবর্তী প্রায় ৩০ বৎসর সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর অনুসারীগণ বৃটিশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার বিচ্ছিন্ন জিহাদ ও প্রতিরোধ চালিয়ে যান। ১৮০৩-৪ সালে "ওহাবী"-গণ মক্কা-মদীনা দখল করে এবং তথাকার প্রচীন মাজার-কেন্দ্রিক সৌধগুলি ভেঙ্গে ফেলে। এতে সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভীর অনুসারীগণ "ওহাবী"-দের মতই একইভাবে শিরক, কুফর, বিদ'আত, কুসংস্কার ইত্যাদির প্রতিবাদ করতেন। এভাবে তাদের মতামতের সাথে "ওহাবী"-দের মতামতের বাহ্যিক সাদৃশ্য ছিল। ১৮২৩ খৃস্টাব্দে সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবী হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় গমন করেন। ইংরেজ শাসকগণ সুকৌশলে প্রচার করে যে, 'স্বাধীনতার নামে যারা আপনাদের ধর্মের বাণী শোনাচ্ছে আসলে তারা ইসলামের শত্রু এবং নবী ও সাহাবাদের অপমানকারী দল, এদের নাম ওহাবী, এরাই আপনাদের প্রিয় রাসুলের (ﷺ) বংশধরদের কবরগুলি ধ্বংস করে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছে ... আর সৈয়দ আহমদ তাদেরই এজেন্ট নিযুক্ত হয়েছে এবং এরা সবাই ওহাবী তাই এরাও আপনাদের শ্রদ্ধেয় পীরবুজুর্গ ও পুর্বপুরুষদের কবর ভাঙ্গতে চায়...।

এভাবে বৃটিশ সরকার বুঝান যে, প্রকৃত ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের কোনো ক্ষোভ নেই। প্রকৃত ইসলাম ও মুসলিমদেরকে তাঁরা খুবই ভালবাসেন। শুধু বিভ্রান্ত ওহাবী সম্প্রদায়ের মানুষদেরকেই তারা দমন করছেন ও শাস্তি দিচ্ছেন। কাজেই এতে সাধারণ ভাল মুসলিমরেদ বিরক্ত হওয়ার বা কষ্ট পাওয়ার কোনো কারণ নেই। সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর শিষ্যদের থেকে ভারতে বিভিন্ন সংস্কারমুখী ধারার জন্ম নেয়। তাঁর শিষ্যদের মধ্য থেকে অনেকে নির্ধারিত মাযহাব অনুসরণ অস্বীকার করে নিজেদেরকে 'আহলে হাদীস' বলে দাবি করেন। তাঁর শিষ্য জৌনপূরের পীর মাওলানা কারামত আলী একটি সংস্কারমুখী ধারার জন্ম দেন। ফুরফুরার পীর মাওলানা আবূ বাক্র সিদ্দীকীও সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর মতানুসারী ও তাঁর প্র-শিষ্য ছিলেন। দেওবন্দী আলিমগণও তাঁরই শিষ্যদের থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন। এদেরর সকলকেই প্রতিপক্ষগণ ও ঔপনিবেশিক সরকার 'ওহাবী', "রঙিন ওহাবী" বা "বর্ণচোরা ওহাবী" বলে আখ্যায়িত করেছেন। সাইয়েদ

আহমদ ব্রেলবীর অন্যতম শিষ্য ও সমসাময়িক সংস্কারক মীর নেসার আলী ওরফে তিতুমির (১৭৮২-১৮৩১) এবং সমকালীন অন্য সংস্কারক হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০)। এদেরকেও ওহাবী নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং এদের আন্দোলন ও প্রতিরোধকে ওহাবী আন্দোলন বলা হয়েছে। ‘‘ওহাবী’’ শব্দের ব্যবহার বুঝতে একটি উদাহরণ পেশ করছি। মীর নিসার আলী ওরফে তীতু মীর ১৭৮২ খৃস্টাব্দে বাংলার ২৪ পরগনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮২৩ সালে হজ্জের সময় মক্কায় সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। তিনি তাঁর মুরীদ হন। দেশে ফিরে তিনি তাঁর এলাকার মানুষদের মধ্যে বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা প্রচার করেন। তিনি বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বললেও কখনোই হিন্দু ধর্ম, ধর্মাবলম্বী বা হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে কিছুই বলেন নি। কিন্তু তাঁর শিক্ষায় সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে ধর্মপালন বৃদ্ধি পাওয়াতে এলাকার হিন্দু জমিদারগণ ক্ষুদ্ধ হন। তাঁরা সাধারণ মুসলিম প্রজাদেরকে জানান যে, প্রকৃত ইসলামকে তাঁরা খুবই ভালবাসেন। তবে ওহাবী মতবাদকে তারা দমন করতে চান। যুগযুগ ধরে মুসলিমগণ হিন্দুদের মতই নাম রেখেছেন, দাড়ি কেটেছেন, গোঁফ রেখেছেন, মসজিদ বানানোর জন্য ব্যস্ত হন নি এবং গোহত্যা করেননি। তীতুমীর ওহাবী মতানুসারে দাড়ি রাখতে, গোঁফ কাটতে, মুসলমানী নাম রাখতে, মুসলমানদের গ্রামে মসজিদ বানাতে ও কুরবানীর নামে গোহাত্যা করতে উৎসাহ দিচ্ছে। এতে হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি নষ্ট হচ্ছে। এজন্য ওহাবী মতবাদ দমন করা অতীব জরুরী। এদের দমনের কারণে ‘‘ভাল’’ মুসলমানদের বিক্ষুদ্ধ হওয়ার বা কষ্ট পাওয়ার কোনোই কারণ নেই।

এজন্য তারাগুনিয়ার জমিদার রামনারায়ন বাবু, পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়, নগরপুরের জমিদার গৌড়প্রসাদ চৌধুরী ও অন্যান্য প্রখ্যাত জমিদার সমবেতভাবে ৫টি বিষয়ে নোটিশ জারি করেন: ‘‘(১) যাহারা তীতুমীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ওহাবী হইবে, দাড়ি রাখিবে, গোঁফ ছাটিবে, তাদের প্রত্যেককে ফি দাড়ির উপর আড়াই টাকা এবং ফি গোঁফের উপর পাঁচ সিকা খাজনা দিতে হইবে। (২) মসজিদ প্রস্তুত করিলে প্রত্যেক কাঁচা মসজিদের জন্য পাঁচশত টাকা ও প্রত্যেক পাকা মসজিদের জন্য এক সহস্র টাকা জমিদার সরকারে নজর দিতে হইবে। (৩) পিতা-পিতামহ বা আত্মীয়- স্বজন সন্তানের যে নাম রাখিবে সে নাম পরিবর্তন করিয়া ওহাবী মতে আরবী নাম রাখিলে প্রত্যেক নামের জন্য খারিজানা ফি পঞ্চাশ টাকা জমিদার সরকারে জমা দিতে হইবে। (৪) গোহত্যা করিলে হত্যাকারীর দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া নেওয়া হইবে, যেন সে ব্যক্তি আর গোহত্যা করিতো না পারে। (৫) যে ব্যক্তি ওহাবী তীতুমীরকে নিজ বাড়ীতে স্থান দিবে তাহাকে তাহার ভিটা হইতে উচ্ছেদ করা হইবে।’’

বস্তুত, তুর্কী খিলাফাত ও বৃটিশ সরকারের ব্যাপক প্রচারের কারণে ‘‘প্রকৃত ইসলাম’’ ও ‘‘ওহাবী ইসলামের’’ এ বিভাজন পাশ্চাত্য গবেষকদের কাছে সার্বজনীনতার রূপ পেয়েছে। বিশ্বের যে কোনো স্থানে সংস্কার আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন, ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা, উপনিবেশ বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বা পাশ্চাত্য বিরোধী আন্দোলনে ধার্মিক মুসলিম, আলিম, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব বা পীর-মাশাইখের সম্পৃক্ততা থাকলেই তাকে ‘‘ওহাবী’’ বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়।

ওহাবী ইসলাম ও প্রকৃত ইসলামের এ বিভাজনের ক্ষেত্রে অনেক পাশ্চাত্য গবেষক প্রকৃত ইসলামকে ‘‘সূফী ইসলাম’’ বলে চিহ্নিত করেন। তাঁদের মতে, সূফী ইসলাম অসাম্প্রদায়িক, অরাজনৈতিক ও উদার। প্রমাণ হিসেবে তারা বলেন যে, এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকার মুসলিম ও অমুসলিম সমাজের অগণিত সূফী দরবারে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল ধর্মের ও বর্ণের মানুষ একত্রিত হচ্ছেন, যিক্র, ওযীফা, সামা-কাওয়ালী ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন এবং তবারুক ও দুআ গ্রহণ করছেন। এ সকল দরবারে আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্যিকতার শিক্ষা দেওয়া হয়, রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি আলোচনা করা হয় না।

আমাদের দেশ ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা সূফী ইসলামের দুটি পর্যায় দেখতে পাই। আমরা দেখি যে, অনেক মুসলিম তাসাউফ ও সূফীবাদের নামে পীর-মাশাইখকে আল্লাহর অবতার বা বিশেষ ‘‘ঐশ্বরিক’’ সম্পর্ক বা ক্ষমতার অধিকারী বলে গণ্য করেন, তাদেরকে সাজদা করেন, তাদের কবর-মাযার বা সমাধি সাজদা করেন, সালাত, সিয়াম ইত্যাদি শরীয়তের আহকাম পালনকে গুরুত্বহীন মনে করেন এবং গান-বাজনা ও নৃত্যগীতিকে সূফী ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ দিক বলে গণ্য করেন। এরা নিজেদেরকে প্রকৃত সূফী ও প্রকৃত সুন্নী বলে দাবি করেন। যারা পীর সাজদা, করব সাজদা, গানবাজনা, ধুমপান ইত্যাদির প্রতি আপত্তি প্রকাশ করেন বা শরীয়ত পালনের বাধ্যবাধকতার কথা বলেন তাদেরকে এ পর্যায়ের সূফীগণ ‘‘ওহাবী’’ এবং ‘‘ওলীগণের দুশমন’’ বলে কঠোরভাবে নিন্দা করেন। অনেকে তামাক, গাজা ইত্যাদি সেবন বা ধুমপানকে সুন্নী ইসলাম ও সূফী ইসলামের মৌলিক পরিচয় বলে গণ্য করেন এবং ধুমপান বিরোধীদেরকে ওহাবী ও ওলীগণের দুশমন বলে নিন্দা করেন। অন্য অনেক মুসলিম পীর-সাজদা, করব-সাজদা, গান-বাজনা ইত্যাদি কর্মকে কঠিনভাবে নিন্দা করেন, শরীয়ত প্রতিপালনকে সূফী ইসলামের মূল বিষয় বলে গণ্য করেন এবং শরীয়ত প্রতিপালনের পাশাপাশি পীর-মাশাইখের নিকট তরীকত শিক্ষা করেন ও পালন করেন। প্রথম পর্যায়ের সুফী ও মারফতীগণের মতানুসারে এরা ওহাবী ও সূফী ইসলামের দুশমন। তবে এরা নিজেদেরকে প্রকৃত সূফী ও সুন্নী বলে দাবি করেন এবং প্রথম পর্যায়ের মানুষদেরকে বিভ্রান্ত বলে গণ্য করেন।

এ পর্যায়ের তাসাউফ-পন্থীদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ওরস, ঈসালে সাওয়াব, মীলাদুন্নবী, সীরাতুন্নবী, যিকরের পদ্ধতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে এ পর্যায়ের সূফীগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ সকল মতভেদের ভিত্তিতে এ পর্যায়ের সূফীগণের একদল আরেকদলকে ওহাবী, নবীর দুশমন বা ওলীগণের দুশমন বলে নিন্দা করেন এবং নিজেদেরকে প্রকৃত সুন্নী ও প্রকৃত সূফী বলে দাবি করেন, যদিও সকলেই পীর-মুরিদী ও তাসাউফে বিশ্বাস করেন ও বিভিন্ন তরীকা অনুসরণ করেন। পাশ্চাত্যের খৃস্টানগণ প্রকৃতিগতভাবেই প্রথম পর্যায়ের সূফী ইসলাম ও এর অনুসারীদের ভালবাসেন। কারণ তাদের ''মানসিকতার'' সাথে এদের ''মানসিকতার'' খুবই মিল। ইউরোপ-আমেরিকা ও অন্যান্য বিভিন্ন দেশে এরূপ সূফীদের মাজলিস- দরবার ও খানকা-মাজারে তারা আগমন করেন, গান-বাজনা ও আধ্যাতিক চর্চায় অংশ নেন। এ সকল সূফীও এদেরকে অত্যন্ত ভালবেসে গ্রহণ করেন। স্বভাবতই পাশ্চাত্যের মানুষেরা বিশ্বের সকল মুসলিম দেশে এরূপ সূফী ইসলামের প্রসার কামনা করেন।

এরূপ সূফী ইসলামের প্রসারই সকল ধর্মের ও ধর্মহীন মানুষদের মধ্যে অনাবিল শান্তি ও সহাবস্থান নিশ্চিত করতে পারে বলে তারা বিশ্বাস করেন। ''সভ্যতার সংঘাতের'' নামে ইসলামী দেশগুলিতে আধিপত্য বিস্তারে আগ্রহী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি প্রথমে ঢালাওভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। কিন্তু তারা দেখেন যে, এতে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বাড়ছে। তখন তারা মুসলমানদেরকে বিভিন্নভাবে ভাগ করে কাউকে পক্ষে ও কাউকে বিপক্ষে নিতে চান। এজন্য প্রথমে তারা লিবারেল (liberal) বা উদার ও (fundamentalist) অর্থাৎ মৌলবাদী বা কট্টরপন্থী বলে ভাগাভাগি করেন। এরূপ ভাগাভাগি মুসলিম দেশগুলিতে তেমন কোনো বাজার লাভ করে না। এজন্য বিগত কয়েক বছর যাবত তারা নতুন একটি ভাগাভাগি বাজারজাত করতে চেষ্টা করছেন, তা হলো সূফী ইসলাম ও ওহাবী ইসলাম।

মুসলিম দেশগুলিতে সূফীগণের প্রভাব ও ''ওহাবী'' শব্দটির প্রতি মুসলিমদের ঘৃণার বিষয়টি তারা জানেন। বৃটিশ সরকার ও হিন্দু জমিদারগণ যেভাবে সাইয়েদ আহমদ, তিতুমীর, শরীয়তুল্লাহ ও অন্যান্য সকল ধর্মীয় সংস্কার ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে ''ওহাবী'' বলে চিত্রিত করে সাধারণ মুসলিমদের কাছে ঘৃণিত করার চেষ্ঠায় অনেকটা সফলতা লাভ করেছিলেন, তেমনি তারা তাদের স্বার্থের সাথে সাংঘষিক সকল ইসলামী কর্মকান্ড ও ব্যক্তিত্বকে ''ওহাবী'' রূপে চিত্রিত করতে চেষ্টা করছেন। অন্তত সুন্নীওহাবী বা সূফী-ওহাবী বিতর্ক ও সঙ্ঘাত উস্কে দিতে পারলে ইসলামী দাওয়াত, শিক্ষা বিস্তার, অশ্লীলতা-মাদকতার প্রতিবাদ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আলিম বা ইসলামপন্থীদের উত্থান নিশ্চিতরূপেই ব্যাহত ও বাধাগ্রস্ত হবে।তারা মূলত সূফী ইসলাম বলতে প্রথম পর্যায়ের সূফীদের বুঝছেন। কারণ, দ্বিতীয় পর্যায়ের সূফীদের মধ্যে শাহ ওয়ালিউল্লাহ, সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবী, তিতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহ প্রমুখের মত ব্যক্তিত্বর আবির্ভাব ঘটতে

পারে, যাদের ক্ষমতায়ন তাদের স্বার্থ রক্ষা করে না। তারা বিশ্বাস করেন যে, প্রথম পর্যায়ের সূফীদের উত্থানই মুসলিম মানসিকতা থেকে জঙ্গিবাদের মূল উৎপাটন করতে সক্ষম এবং এ পর্যায়ের সূফী ইসলামই বিশ্বের মানুষদেরকে জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ ও ধর্মীয় সংঘাত থেকে রক্ষা করে সকল ধর্মের শান্তি পূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করতে পারে। শুধু তাই নয়, এদের প্রতিষ্ঠা বিশ্বের প্রধান দুটি ধর্ম: খৃস্টধর্ম ও ইসলামকে একেবারেই কাছাকাছি করে দিতে পারে।

বস্তুত প্রথম পর্যায়ের সূফীগণ এবং পাশ্চাত্য নেতৃবৃন্দ দ্বিতীয় পর্যায়ের সূফীগণকে ‘‘প্রকৃত ওহাবী’’ বা ‘‘বর্ণচোরা ওহাবী’’ বলে বিশ্বাস করেন। এদের হাতে তাদের স্বার্থ নিরাপদ নয় বলেও তারা জানেন। তবে মুসলিম দেশগুলিতে দ্বিতীয় পর্যায়ের সূফীগণের প্রভাব সম্পর্কেও তারা সচেতন। এজন্য তার ‘‘সূফী ইসলামের’’ নামে প্রথম পর্যায়ের সূফীদের নেতৃত্বাধীনে ও তাদের প্রভাব বলয়ের মধ্যে থেকে উভয় পর্যায়ের সূফীগণকে একত্রিত করে তাদেরকে ‘‘ওহাবী’’-দের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে উদ্বুদ্ধ করছেন। তারা বুঝাচ্ছেন যে, যারা ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্র, বিচার, অর্থব্যবস্থা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার দাবি করছেন তারা মূলত ওলীগণের মাজারভাঙ্গা সৌদী ওহাবীগণের দালাল ও তাদের মতের অনুসারী। এরা ক্ষমতা লাভ করলে এরাও পীর-মাশাইখ ও কবর-মাজার ধ্বংস করবে। কাজেই এদেরকে প্রতিহত করতে ঐক্যবদ্ধ হোন। একথা নিশ্চিত যে, সাধারণ মুসলিম, আলিম ও পীর-মাশাইখ তাদের এরূপ প্রচারণায় প্রভাবিত হবেন। এছাড়া এ অযুহাতে ওহাবী-সুন্নী বির্তর্ক ও হানাহানির প্রসার ঘটিয়ে মুসলিমদেরকে সাম্রাজ্যবাদ ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বা ইসলামী মূল্যবোধ প্রচারের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হওয়া থেকে বিরত রাখা সম্ভব হবে বলে তারা মনে করছেন।

বস্তুত ‘‘ইসলাম’’ নামের যেমন ব্যাপক অপব্যবহার করা হয়েছে এবং ইসলামের নামে ইসলাম বিরোধী কর্ম করা হয়েছে ও হচ্ছে, তেমনি ‘‘সূফী’’ শব্দেরও ব্যাপক অপব্যবহার করা হয়েছে। তাসাউফ, সূফী, পীর, দরবেশ ও ওলীগণের নামে অনৈসলামিক কর্মকান্ডও ঘটেছে অনেক। তবে সর্বজন স্বীকৃত সূফী-দরবেশগণের জীবন ও কর্ম পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি যে, তাঁরা সকলেই সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতি সচেতন ছিলেন এবং সমাজ পরিবর্তনে তাঁদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। প্রায় সকল সূফী ‘‘তরীকা’’-র মূল সূত্র হিসেবে আবূ বাকর সিদ্দীক (রা) ও আলী (রা)-কে উল্লেখ করা হয়েছে। যাকাত অমান্যকারী, ধর্মত্যাগী, ধর্মীয় অনাচারে লিপ্তদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁরা ছিলেন মুসলিম উম্মাহর পথিকৃতি। হাসান বসরী, ইবরাহীম আদহাম, জুনাইদ বাগদাদী, আব্দুল কাদির জীলানী, আবূ হামিদ গাযালী, মুজাদ্দিদ-ই আলফিসানী, শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী, সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবী, এমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী, কারামত আলী জৌনপুরী, আবূ বকর সিদ্দীকী ফুরফুরাবী (রাহিমাহুমুল্লাহ) ও অন্যান্য সকল সুপ্রসিদ্ধ সূফী-সাধক আত্মশুদ্ধি ও

আধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতি নিয়ে কথা বলেছেন, শাসকদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন, কারাবরণ করেছেন বা শাহাদাত লাভ করেছেন।

আধুনিক রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে এদের কর্মপদ্ধতির পার্থক্য হলো ক্ষমতায় না যেয়ে ক্ষমতাসীনদের সংশোধনের চেষ্টা করা। এরা নিজেরা রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করেননি বরং ক্ষমতাসীনদেরকে নসীহত করেছেন, অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন, ন্যায়ের পক্ষে উৎসাহ দিয়েছেন, সহযোগিতা করেছেন, জনগণকে সচেতন করেছেন, সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিক শাসন ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধে শরীক হয়েছেন এবং এ সকল কর্মকান্ডে যে সকল ব্যক্তি বা দলকে অপেক্ষাকৃত ভাল বলে মনে করেছেন তাদেরকে সমর্থন করেছেন বা উৎসাহ দিয়েছেন।

তথাকথিত ''জঙ্গি'' কর্মকান্ড বা উগ্রতার সাথে তাদের কর্মপদ্ধতির পার্থক্য হলো অন্যায়ের প্রতিবাদ করা কিন্তু শাস্তি বা বলপ্রয়োগের চেষ্টা না করা। তারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন, নসীহত করেছেন, ক্ষমতাসীন ও অন্যান্য সকলকে অন্যান্য দমন করতে, প্রতিবাদ করতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন, কিন্তু নিজে অন্যায় দমনের নামে শক্তি প্রয়োগ করেননি, আইন অমান্য করেননি, আইন নিজের হাতে তুলে নেন নি এবং আইন অমান্য করার ঘোর বিরোধিতা করেছেন।

এভাবে আমরা দেখছি যে, প্রকৃত সূফীগণ কখনোই সমাজ-বিমুখ বা রাজনীতি-বিমুখ ছিলেন না। ''সূফী ইসলাম''-কে সমাজ, রাষ্ট্র ও জগৎ-বিমুখ বলে চিহ্নিত করা ও সকল সংস্কার আন্দোলনকে ''ওহাবী'' বলে চিত্রিত করার কোনো ভিত্তি নেই। তথাকথিত 'ইসলামী সন্ত্রাস' বা জঙ্গিবাদের নেতৃত্বে উসামা বিন লাদেনের মত সৌদি বংশোদ্ভুত ব্যক্তিত্ব রয়েছেন বলে শোনা যায়। সৌদি আরবের বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থা এদের অর্থায়ন করেন বলে দাবি করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিশেষত উপমহাদেশে আহলে হাদীস ও দেওবন্দী-পদ্ধতির কওমী মাদ্রাসায় শিক্ষিত দু-চার ব্যক্তির এর সাথে সংশি-ষ্টতার কথা শোনা যায়। এছাড়া এদের মধ্যে কবর-মাযার ইত্যাদির বিরোধিতা দেখা যায়। সর্বোপরি এরা নিজেদের মতামত প্রতিষ্ঠার জন্য মৌখিক প্রচার ছাড়াও অস্ত্র হাতে তুলে নিচ্ছেন। এজন্য অনেক গবেষক মনে করেন যে, ওহাবী মতবাদের প্রসারই বর্তমান জঙ্গিবাদের উত্থানের কারণ।

তবে লক্ষণীয় যে, উসামা বিন লাদেন-এর আন্দোলনের গোড়া পত্তন হয় সৌদি-ওহাবী রাষ্ট্রের বিরোধিতার মাধ্যমে। তার অনুসারীরা তথাকার রাজতন্ত্র, মার্কিন সৈন্য, অনাচার ইত্যাদির বিরোধিতা করেন এবং সৌদি রাষ্ট্র ও নাগরিকদের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন। এছাড়া মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাবের বংশধরসহ সকল সৌদি আলিম বিন

লাদেনের আন্দোলন ও কার্যক্রমের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সোচ্চার। সর্বোপরি, বিভিন্ন দেশের সংস্কার বা প্রতিরোধ আন্দোলনকে 'ওহাবী' বলে আখ্যায়িত করার কোনো ভিত্তি নেই। বস্তুত মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব ও তাঁর আদর্শ প্রাপ্যের চেয়ে বেশি গুরুত্ব ও মর্যাদা লাভ করেছে তুর্কি খিলাফতের প্রচার ও বৃটিশ সরকারের সুযোগসন্ধানের কারণে। ওহাবী মতবাদ ও আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে একান্তই একটি আঞ্চলিক বিষয় ছিল। অন্যান্য মুসলিম দেশের সংস্কার-প্রতিরোধ ও ধর্মকেন্দ্রিক সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলনের মতই ভালমন্দ মেশানো একটি বিষয়। অন্যান্য দেশে মুসলিমগণ তাদের পরিবেশ ও প্রয়োজন অনুসারে অনুরূপ আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। যেহেতু ওহাবীগণ ও অন্যান্য দেশের মুসলিমগণ সকলেই একই সূত্র, অর্থাৎ কুরআন, হাদীস, ইসলামী ফিক্হ ও ইসলামের ইতিহাস থেকে নিজেদের মতামত সংগ্রহ করেছেন, সেহেতু তাদের মতামত ও কর্মের মধ্যে মিল থাকাই স্বাভাবিক। এ জন্য সকল কৃতিত্ব মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাবকে দেওয়ার কোনো কারণ নেই। আফগানিস্থান ও ইরাকে বিন লাদেনের মতবাদ প্রসার লাভ করেছে। আর এ দুটি দেশই ঘোর ওহাবী বিরোধী। আফগানিস্থানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠী হানাফী মাযহাবের কঠোর অনুসারী, পীর মাশাইখদের ভক্ত এবং ওহাবীদের বিরোধী। ইরাকে সাদ্দাম হোসেনের দীর্ঘ শাসনামলে ওহাবী বা অন্য যে কোনো সংস্কারমুখী আলিম ও মতবাদকে কঠোরভাবে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। শুধুমাত্র সূফীদের বিরুদ্ধে কোনো কঠোরতা অবলম্বন করা হয় নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ দুই দেশে জঙ্গিবাদের প্রসার থেকে বুঝা যায় যে, জঙ্গিবাদের কারণ অন্য কোথাও নিহিত রয়েছে।

আমরা আগেই দেখেছি যে, সন্ত্রাসীদের জাতি, ধর্ম গোত্র ইত্যাদিকে ঢালাওভাবে 'সন্ত্রাসের' কারণ বা চালিকা শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতা সঠিক নয়। এতে সন্ত্রাস দমনের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। কারণ, কোনো, জাতি, ধর্ম বা গোত্রের সকল মানুষকে তো আর ঢালাওভাবে বিচার করা যায় না। জঙ্গিবাদের দায়িত্ব 'ওহাবী মতবাদের' উপর চাপানোর বড় বিপত্তি হলো, এতে সমস্যা সমাধানের পথ হারিয়ে যাবে। কেননা, সৌদি ওহাবীদের সাথে জঙ্গিবাদের সম্পর্ক স্থাপন করা কঠিন, কারণ জঙ্গিবাদ তাদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত। আর অন্য কোনো দেশের কেউ নিজেকে ওহাবী বলে স্বীকার করেন না, কিন্তু প্রায় সকল ধর্মীয় দলই বিরুদ্ধবাদীদের দ্বারা 'ওহাবী' বলে আখ্যায়িত। প্রত্যেকেই দাবি করেন যে, তাঁরা সরাসরি কুরআন, হাদীস, ফিকহ ও পূর্ববর্তী ইমামগণের মতের ভিত্তিতে তাদের মত ও দল গঠন করেছেন; মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাবের নিজস্ব কোনো মত তারা মানেন না। এমনকি সৌদি আরবের আলিমগণ কখনোই নিজেদেরকে ওহাবী বলে স্বীকার করেন না। তাঁরা মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাবকে একজন সংস্কারক হিসেবে মনে করেন এবং তাঁর সকল মতামতই কুরআন, সুন্নাহ ও পূর্ববর্তী ইমামগণের থেকে গৃহীত বলে দাবি ও প্রমাণ করেন।

১. ৬. আলোচিত চতুর্থ কারণ: পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্র

বিশ্বের সর্বত্রই সাধারণ আলিম-উলামা, পীর-মাশাইখ, ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও ইসলামী দলসমূহ জঙ্গিবাদের বিরোধিতা করছেন এবং নিন্দা করছেন। সাধারণভাবে তাঁরা উপরের তিনটি কারণকে জঙ্গিবাদের উত্থানের কারণ বলে স্বীকার করেন না। রবং তাঁরা দাবি করেন যে, ইসলামের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্রের কারণেই জঙ্গিবাদের উত্থান। ইসলামকে কলঙ্কিত করতে, ইসলামী দেশগুলির আর্থ-সামাজিক উন্নতি বন্ধ করতে এবং এ সকল দেশে সামরিক আধিপত্য বিস্তার করতেই তারা গোপন অর্থায়নে কিছু মুসলিম যুবককে বিভ্রান্ত করে এরূপ জঙ্গিবাদ সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা তাদের এ দাবির পক্ষে প্রমাণ নয় বরং যুক্তি পেশ করেন। তাঁরা দাবি করেন যে, বোমাবাজি, সন্ত্রাস ইত্যাদি মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে কখনো দেখা যায় নি। 'সভ্যতার সংঘাত' থিওরি আবিষ্কারের পূর্বে বিগত দেড় হাজার বৎসর ধরে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে 'জিহাদ' নামে এরূপ সন্ত্রাস কখনোই দেখা যায় নি। রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিচালিত যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কোথাও কোনো মুসলিম ব্যক্তিগতভাবে বা দলগত ভাবে কাউকে গুপ্ত হত্যা করেছে, কারো বাড়িতে অগ্নি সংযোগ করেছে.... ইত্যাদির কোনো নযির আমরা দেখতে পাই না। 'সভ্যতার সংঘাত' থিওরি আবিষ্কারের পরে পাশ্চাত্য বিশ্ব নিজ প্রয়োজনেই এ অবস্থা তৈরি করে নিয়েছে।

ক্রুসেড যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্ব মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন ইউরোপীয় খৃস্টানগণ। ১ম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পতন ও মুসলিম বিশ্বে উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে ক্রুসেডের সমাপ্তি হয়েছে বলে ধারণা করেছিলেন তারা। বিংশ শতাব্দীর ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষত সেভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পরে তারা হিসাব নিকাশ পাল্টে ফেলেন। তারা 'সভ্যতার সংঘাতের' থিওরী উপস্থাপন করেন। তারা ভালভাবেই উপলব্ধি করেন যে, মুসলিম বিশ্বকে তার নিজের গতিতে অগ্রসর হতে দিলে ২১শ শতকের প্রথমার্ধেই মুসলমানগণ 'বিশ্ব শক্তিতে' পরিণত হবে। অর্থনৈতিক স্থিতি, প্রযুক্তিগত শক্তি ও সমর শক্তিতে তারা শক্তিশালী হয়ে যাবে এবং তাদের 'নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরানোর' কোনো সুযোগ থাকবে না। মুসলিম উম্মাহকে ঠেকাতে হলে তাদেরকে আঘাত করতে হবে।

কিন্তু আঘাত তো কোনো 'কারণ' ছাড়া করা যায় না। স্বভাবতই কোনো মুসলিম দেশই পাশ্চাত্যের সাথে কোনো সংঘাতে যেতে রাজি নয়। কিন্তু সংঘাত না হলেও তো কাজ উদ্ধার করা যাচ্ছে না। বিশেষত দুর্বলকে সংঘাতের মধ্যে নামাতে পারলে বিজয় নিশ্চিত থাকে। এজন্যই তাঁরা এ জঙ্গিবাদের জন্ম দিয়েছেন। এছাড়া পাশ্চাত্য বিশ্ব আরো একটি গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। তা হলো তাদের দেশগুলির নীরব ''ইসলামায়ন''।

ইসলাম মানুষের জীবন-ধর্ম। ইসলামের সহজ-সরল বিশ্বাস ও কর্মের সমন্বয় সহজেই মানুষকে আকৃষ্ট করে। মানুষের প্রকৃতির সাথে এ ধর্ম মিশে একাকার হয়ে যায়। মানব প্রকৃতি অতি সহজেই একে গ্রহণ করে। আধুনিক সভ্যতার নৈতিক অবক্ষয়, অশ্লীলতা, বিলাসিতা ও অমানবিকতার মধ্যে নিপতিত পাশ্চাত্য দেশগুলির অনেক মানুষই ইসলাম গ্রহণ করছেন। ইসলাম সম্পর্কে সামান্য কিছু তথ্য জানলেই অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেন। অশ্লীলতা, বিলাসিতা ও মাদকতার প্রসারে ইউরোপ-আমেরিকার পরিবারিক কাঠামো ভেঙ্গে গিয়েছে এবং তথাকার প্রকৃত ''সাদা'' অধিবাসীদের জনসংখ্যা দ্রুত কমছে। এ সকল দেশ তাদের শিল্প, কারখানা ও উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে বাইরের অভিবাসী গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। এ ভাবে প্রতিনিয়ত অনেক মুসলিম এ সকল দেশে প্রবেশ ও বসবাস করছেন। এদের সংস্পর্শে এসে এ সকল দেশের মূল অধিবাসীদের অনেকে ইসলাম গ্রহণ করছেন। এ ভাবে এসকল দেশে নীরব ইসলামায়ন চলছে। এ ইসলামায়ন ঠেকাতে, মুসলিম অভিবাসীদেরকে নাগরিকত্ব না দিতে, বহিস্কার করতে এবং সর্বোপরি মূল অধিবাসীদেরকে ইসলাম থেকে দূরে রাখতে ইসলাম বিরোধী অপপ্রচার ও ইসলামের ''দানবায়ন'' অতীব জরুরী। আর এজন্য জঙ্গিবাদ ইসূ অতীব কার্যকর বলে মনে করেছেন তারা। বিশেষত খৃস্টীয় দ্বিতীয় মিলেনিয়ামের শুরু থেকে ক্রুসেড যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে ইসলাম ধর্ম ও রাসুলুল্লাহ (ﷺ)কে দানব রূপে চিত্রিত করার জন্য ইউরোপের চার্চ ও রাষ্ট্রপ্রশাসন ইসলামের বিরুদ্ধে কয়েকশত বৎসর যাবত যে সকল জঘন্য মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়েছে সেগুলির অন্যতম ছিল ইসলামের জিহাদ বিষয়ক নির্দেশনার অপব্যখ্যা। আমরা এ পুস্তকের শেষ দিকে ইসলামের জিহাদ ও বাইবেলীয় জিহাদ বিষয়ক আলোচনায় এ বিষয়ে কিছু দেখতে পাব। এজন্য পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ ইসলামী দেশগুলির নিয়ন্ত্রন ও তাদের দেশগুলির নীরব ইসলামায়ন রোধে জঙ্গিবাদ ইসূকেই সর্বোত্তম বিবেচনা করেন এবং তাদের স্বার্থেই ''জঙ্গিবাদ'' সৃষ্টি করেন।

এ সকল মুসলিম পন্ডিত আফগান জিহাদকে অন্যতম দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করেন। সোভিয়েত আগ্রাসনের প্রতিবাদে আফগানিস্থানের মুসলিম জনগোষ্ঠী প্রতিরোধ শুরু করে। যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগীরা এ সুযোগে এ সকল প্রতিরোধ যোদ্ধাদেরকে অস্ত্র, ট্রেনিং, প্রযুক্তি ও সকল প্রকার সাহায্য দিয়ে এগিয়ে নেয়। সারা বিশ্বে এদের পক্ষে প্রচার চালায়। এরপর তারা তাদেরকে উস্কানির মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য করে। তারা বেপরোয়া হয়ে আমেরিকার বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলেন। পরিত্যক্ত ও উত্তেজিত এ সকল মানুষ আবেগ তাড়িত হয়েও অনেক কাজ করতে থাকেন। এছাড়া এ সকল 'মুজাহিদ'দের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদীদের নিজস্ব অনুচর রয়েছে। যারা এদেরকে 'সংঘাতের পথে' যেতে প্ররোচিত করছে। এরা জিহাদ ও কিতাল বিষয়ক আয়াত ও হাদীসগুলির অপব্যাখ্যা করে মুসলিম উম্মাহকে 'প্রিম্যাচিউরড' সংঘাতের পথে যেতে উস্কানি দিচ্ছে। এভাবে সারা মুসলিম বিশ্বে 'জিহাদের' বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে।

এ সকল গবেষক আরো একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তারা বলেন যে, খিলাফাতে রাশেদার পর থেকে ইসলামী দেশগুলিতে ক্রমান্বয়ে ধর্মপালনে শিথিলতা, অনাচার, অশ্লীলতা, ইসলাম বিরোধী মতবাদ ও আকীদার প্রসার ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর ও গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে। রাষ্ট্র, প্রশাসন ও আমীর-ওমরাগণ এ অবক্ষয় রোধের চেষ্টা করেননি, উপরন্তু অনেক সময় তারা তার প্রসারে সহযোগিতা করেছেন। আলিম-উলামা, পীর-মাশাইখ ও ধার্মিক মানুষেরা সাধ্যমত 'দাওয়াত' বা প্রচার ও উপদেশের মাধ্যমে এগুলির সংশোধনের চেষ্টা করেন। তবে তারা ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধে নামে বলপ্রয়োগ বা শাস্তি প্রয়োগ করেননি। সর্বোপরি তারা অনাচার ও অবক্ষয়ের সর্বগ্রাসী প্রসারের জন্য রাষ্ট বা সরকারকে দায়ী করে রাষ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেননি বা ''ধার্মিকদের রাষ্ট্র'' প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেননি। বরং তারা এ সকল রাষ্ট্র ও সরকার আনুগত্য বজায় রেখেছেন এবং বহির্শত্রুর বিরুদ্ধে এদেরে জিহাদে শরিক হয়েছেন। মূলত এ কারণেই দ্বিতীয় মিলেনিয়ামের ক্রুসেড যুদ্ধে ইউরোপীয় ক্রুসেডারদের আগ্রাসন রোধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন মুসলমানরা।

কিন্তু বর্তমানে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এখন অনেক মুসলিম দীন প্রতিষ্ঠার নামে মুসলিম দেশের স্থিতি নষ্ট করছেন, যাতে বহির্শত্রুর আগ্রাসন প্রতিরোধের ক্ষমতা হারাচ্ছে মুসলিম সমাজ। উদাহরণ হিসেবে তারা বলেন যে, পাকিস্তান ও আফগানিস্তনে মার্কিন অর্থায়ন ও প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত কতিপয় মুজাহিদ এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত ''মাদ্রাসা'' থেকে আগত কোনো কোনো ছাত্র ইসলামী আইন বা শরীয়া আইন বাস্তবায়ন, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, ন্যায়ের আদেশ, অন্যায়ের নিষেধ ইত্যাদি শ্লোগানের ভিত্তিতে এমন কর্মকান্ড পরিচালন করছেন যা পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ঐক্য, অর্থনৈতিক ও সামারিক প্রবৃদ্ধি কঠিনভাবে ব্যাহত করেছে। এখন যদি আমরা আরেকটি ক্রুসেড কল্পনা করি তাহলে অনুভব করব যে, এরূপ ক্রুসেড প্রতিহত করার ক্ষমতা হারাচ্ছে পাকিস্তান এবং ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়ার মত মানুষও হারাচ্ছে।

'ইসলামপন্থী'দের এসকল দাবি-দাওয়া ও যুক্তি যতই জোরালো হোক এর পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। এছাড়া এ দাবিও সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে কোনোরূপ সহায়তা করে না। শত্রু তো শত্রুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবেই। যদি কেউ সত্যিই ইসলামের শত্রু হন তবে তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। এজন্য তাঁদের দোষ দেওয়া বা তার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা অর্থহীন কর্ম। আমাদের দেখতে হবে কি কারণে মুসলিম যুবকগণ তাদের ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছেন। কারণগুলি চিহ্নিত করে সেগুলির প্রতিকার না করতে পারলে আমাদের দোষারোপ ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাঁদের ষড়যন্ত্র সফলতা লাভ করবে।

জিহাদ ও হত্যা - (জিহাদ বিষয়ক অপপ্রচার)

ইসলাম বিষয়ক বিভ্রান্তি ও অপপ্রচারের মূলে রয়েছে ''জিহাদ''। অনেক সময় বলা হয়, ধর্মই সকল হানাহানির মূল, ধর্মের নামেই রক্তপাত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। কী জঘন্য মিথ্যাচার!! এ কথা সত্য যে, অনেক সময় ধর্মকে হানাহানির হাতিয়ার বানানো হয়, আবার অনেক সময় ধর্ম সত্য ও ন্যায়ের স্বার্থে যুদ্ধের অনুমতি দেয়। কিন্তু কখনোই ধর্মের নামে সবচেয়ে বেশি রক্তপাত হয় নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, কমুনিষ্ট চীনের সাথে কমুনিষ্ট ভিয়েতনামের যুদ্ধ, আমেরিকার সাথে ভিয়েতনামের যুদ্ধ ইত্যাদি যুদ্ধে কোটি কোটি মানুষ মরেছে। কম্পূচীয়ায় কমুনিষ্ট খেমার রূজের হাতে লক্ষলক্ষ মানুষের ভয়ঙ্কর মৃত্যু, জোসেফ স্টালিনের নির্দেশে প্রায় সাড়ে তিন কোটি মানুষের হত্যা, মাওসেতুং-এর চীনে প্রায় দু কোটি মানুষের হত্যা, মুসোলিনির নির্দেশে ইটালির ৪ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ও এরূপ অগণিত মানুষের হত্যা সবই কি ধর্মের নামে হয়েছে?

কখনো বলা হয়, ইসলামই ধর্মের নামে ''জিহাদ'' বা ''ধর্মযুদ্ধ'' বৈধ করেছে। এর চেয়ে বড় মিথ্যা আর কী হতে পারে? হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ মহাভারত ও রামায়ন পুরোটায় যুদ্ধ ও হানাহানি নিয়ে। গীতা ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে যুদ্ধের নির্দেশ রয়েছে। বাইবেলে বারংবার যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদে ''বাইবেলীয় জিহাদ'' ও ''ইসালমের জিহাদ'' বিষয়ে কিছু আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

জিহাদ বিষয়ক আরেকটি বিভ্রান্তি জিহাদকে ''পবিত্র যুদ্ধ'' বা ''ধর্মযুদ্ধ'' বলে আখ্যায়িত করা। জিহাদ অর্থ কখনোই ''পবিত্র যুদ্ধ'' (holy war) বা ''ধর্মযুদ্ধ'' (relegious war/crusade) নয়। পবিত্র যুদ্ধ, ধর্মযুদ্ধ, ক্রুসেড ইত্যাদি সবই খৃস্টান চার্চ ও যাজকদের আবিষ্কৃত পরিভাষা। আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদে দেখব যে, ইসলামের পরিভাষায় জিহাদ অর্থ ''রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ''। মুসলিম রাষ্ট্রের শত্রুদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় যুদ্ধকে ইসলামের জিহাদ বলা হয়েছে। সাধারণভাবে কাফির বা অমুসলিম রাষ্ট্রই মুসলিম রাষ্ট্রের শত্রুরাষ্ট্র; এজন্য জিহাদের ক্ষেত্রে শত্রুদেরকে ''কাফির'', ''মুশরিক'' বা অমুসলিম বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

জিহাদ বিষয়ে আরেকটি বিভ্রান্তি হলো, মুসলিমরা ধর্মপ্রচার বা ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করে বা ইসলাম তরবারীর জোরে প্রচারিত হয়েছে বলে দাবি করা। এটি শুধু জঘন্য মিথ্যাই নয়, বরং প্রকৃত সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত তথ্য। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে, বাইবেলে ধর্মের কারণে মানুষ হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বারংবার বিধর্মীদের উপাসনালয় ভেঙ্গে ফেলার, দেশের বিধর্মী নাগরিকদের উৎসবে ডেকে এনে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করার ও নিরিহ বির্ধমীদের ধরে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৩২৫ খৃস্টাব্দে সম্রাট কনস্টানটাইন খৃস্টধর্মকে রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা দেন। সেদিন থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত খৃস্টান চার্চ, পোপ, প্রচারক ও রাষ্ট্রগুলির ইতিহাস হলো রক্তের ইতিহাস। অধার্মিকতা বা heresy দমনের নামে অথবা ধর্ম প্রচারের নামে পরধর্ম অসহিষ্ণুতা, পরধর্মের প্রতি বিষোদ্গার, জোরপূর্বক ধর্মান্তর, অন্য ধর্মাবলম্বীদের হত্যা, নির্যাতন বা জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করা খৃস্টান ধর্মের সুপরিচিত ইতিহাস। পক্ষান্তরে ইসলামে শুধু রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার জন্যই যুদ্ধ বৈধ করা হয়েছে, ধর্ম প্রচারের জন্য নয়। ইসলামে যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কখনোই অমুসলিম হওয়ার কারণে কাউকে হত্যা করা হয় নি বা জোরপূর্বক মুসলিম বানানো হয় নি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)- এর মদীনায় আগমনের পূর্বে তথাকার অনেকের সন্তান ইহূদী ধর্ম গ্রহণ করেছিল। এরা ইসলাম গ্রহণের পরে তাদের সন্তানদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য চাপ প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদেরকে এরূপ চাপ প্রয়োগ থেকে নিষেধ করেন এবং তাদেরকে তাদের পছন্দের ধর্ম পালনের অধিকার প্রদান করেন।

দীন প্রতিষ্ঠা বা দীন প্রচারের জন্য হত্যা, জিহাদ বা যুদ্ধ তো দূরের কথা কোনোরূপ শক্তিপ্রয়োগও নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেছেন:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"দীনে কোনো জবরদস্তি নেই। ভ্রান্তি থেকে সত্য সুস্পষ্ট হয়েছে। যে তাগূতকে অবিশ্বাস করবে এবং আল্লাহকে বিশ্বাস
করবে সে এমন এক মযবুত হাতল ধরবে যা কখনো ভাঙ্গবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা প্রজ্ঞাময়।"

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

من قتل نفسًا معاهدًا لم يَرَحْ رائحةَ الجنةِ ، وإنَّ رِيحَها ليُوجدُ من مسيرةِ أربعين عامًا

"যদি কোনো ব্যক্তি মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিক বা মুসলিম দেশে অবস্থানকারী অমুসলিম দেশের কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করে তবে সে জান্নাতের সুগন্ধও লাভ করতে পারবে না, যদিও জান্নাতের সুগন্ধ ৪০ বৎসরের দুরত্ব থেকে লাভ করা যায়।"

বিধর্মীকে হত্যা তো দূরের কথা, বিধর্মীর সাথে অভদ্র আচরণ করতেও নিষেধ করা হয়েছে। তাদের ধর্মবিশ্বাস বা উপাস্যদেরকে গালি দিতে নিষেধ করা হয়েছে। মুসলিম তাঁর নিজের বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করবেন, তবে কারো গালি দিবেন না বা কারো অনুভূতি আহত করবেন না। কারণ এতে পারস্পারিক গালাগালিই বাড়বে। প্রত্যেকেই তো তার ধর্মকে ভালবাসে। আল্লাহ মানব প্রকৃতি এভাবেই সৃষ্টি করেছেন। আর কারো ভক্তি ও ভালবাসা আহত করার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। মহান আল্লাহ বলেন:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না; কারণ এতে তারাও সীমালঙ্ঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালি দিবে। এভাবেই আমি প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপ সুশোভন করেছি; অতঃপর তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন, তখন তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।"

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ

"তোমরা উত্তম পন্থায় ছাড়া অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের অনুসারীদের সাথে বিতর্ক করবে না, তবে তাদের মধ্যে যারা সীমালঙ্ঘন করেছে তারা ব্যতিক্রম।"

জুইশ এনসাইক্লোপিডীয়া, অন্যান্য বিশ্বকোষ ও ইতিহাস প্রমাণ করে যে, বিগত দেড় হাজার বছরে ইউরোপের সকল খৃস্টান দেশে ইহূদীদের উপর বর্বর অত্যাচার করা হয়েছে, জোর পূর্বক তাদের ধর্মান্তরিত করা হয়েছে, তাদেরকে গণহারে হত্যা করা হয়েছে, তাদেরকে গণ-আত্মহত্যায় বাধ্য করা হয়েছে এবং নানভাবে তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। অথচ এ সময়ে মুসলিম দেশগুলিতে ইহূদীরা পরিপূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার নিয়ে বসবাস করেছেন।

প্রায় দেড় হাজার বৎসর ধরে মুসলিমগণ আরববিশ্ব শাসন করেছেন। সেখানে দেড় কোটিরও বেশি খৃস্টান ও কয়েক লক্ষ ইহূদী এখন পর্যন্ত বংশপরম্পরায় বসবাস করছে। ভারতে মুসলিমগণ প্রায় একহাজার বছর শাসন করেছেন, সেখানে প্রায় শতকরা ৮০ জন হিন্দু। অথচ খৃস্টানগণ যে দেশই দখল করেছেন, জোরযবরদস্তি করে বা ছলে-বলে সেদেশের মানুষদের ধর্মান্তরিত করেছেন অথবা হত্যা ও বিতাড়ন করেছেন।

ইসলাম যদি তরবারীর জোরেই প্রচারিত হবে তাহলে ইন্দোনেশিয়া বিশ্বের সর্ববৃহৎ ইসলামী দেশ হলো কি করে? ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন্স, ব্রুনাই ও অন্যান্য দেশে তো কোনো মুসলিম বাহিনী কখনোই যায় নি। বিগত অর্ধ শতাব্দি যাবৎ ইসলাম The firstest growing religion বা সর্বাধিক বর্ধনশীল ধর্ম। ইউরোপ ও আমেরিকা-সহ সকল দেশের হাজার হাজার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছেন। কোন্ তরবারীর ভয়ে তারা ইসলাম গ্রহণ করছেন?

এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, জিহাদ মূলত ইসলামী রাষ্ট্রের সংরক্ষণ ও ইসলামী দাওয়াতকে এগিয়ে নেওয়ার "উপকরণ"। প্রয়োজনে তা অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। তবে সর্বাবস্থায় চেষ্টা করতে হবে এ ব্যবস্থা এড়িয়ে সন্ধি বা শান্তির মাধ্যমে মূল উদ্দেশ্য সাধান করার। জিহাদের বারংবার আদেশ করা হলেও তার জন্য অনেক শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে, তাকে ফরয আইন বলে

কোথাও উল্লেখ করা হয় নি এবং তা পরিত্যাগের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কাজেই পরিত্যাগযোগ্য একটি কম পালনের জন্য মুমিন কখনোই ভয়ঙ্করতম একটি হারামে লিপ্ত হতে পারেন না। এক্ষেত্রে তাঁদের মূলনীতি ছিল যে, ভুল জিহাদের মানুষ হত্যা বা মানুষের ক্ষতি করার চেয়ে সঠিক জিহাদ বর্জন করা অনেক শ্রেয়।
এভাবে আমরা দেখি যে, সাহাবীগণ সন্দেহের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে বৈধ জিহাদেও অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতেন। আর রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের বাইরে কখনোই কোনো যুদ্ধ তারা বৈধ বলে মনে করেননি। খারিজীগণের আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ক হাদীসগুলিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) খারিজীদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি তিনি বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে পাবে তারা যেন তাদেরকে হত্যা করে।" সাহাবীগণ এ থেকে কখনোই বুঝেন নি যে, খারিজীদেরকে পেলেই হত্যা করতে হবে। তাঁরা কখনোই যুদ্ধের ময়দান ছাড়া অন্যত্র কোনো সুপরিচিত খারিজী নেতাকেও হত্যা করেননি।

একেবারে অস্ত্রাঘাতের সময়ও যদি কোনো শত্রু সৈন্য নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে তবে তাকে আর আঘাত করা যাবে না। বস্তুত একজন ডাক্তার যেমন সর্বাত্মক চেষ্টা করেন রোগীর অঙ্গচ্ছেদ না করে চিকিৎসা করারএকান্ত বাধ্য হলেই কেবল তার কোনো অঙ্গ কেটে প্রাণ বাচানোর চেষ্টা করেন; তেমনি ইসলামে সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে প্রতিটি মানুষের প্রাণ রক্ষা করার।

কেবলমাত্র যোদ্ধা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত

কিতালের অন্য শর্ত, শুধু যারা যুদ্ধ করতে অস্ত্রধারণ করে সামনে এসেছে তাদেরই সাথে যুদ্ধ করতে হবে।

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর তাদের সাথে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছে। কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করবে না, আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।"[16] এ নির্দেশের মাধ্যমে ইসলাম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও যুদ্ধের নামে অযোদ্ধা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করা, অযোদ্ধা মানুষদেরকে হত্যা করা ইত্যাদি সন্ত্রাসের পথ রোধ করেছে। যোদ্ধা ছাড়া কারো সাথে যুদ্ধ করা যাবে না এবং যুদ্ধের ক্ষেত্রেও সীমালঙ্ঘন, আগ্রাসন ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে হাদীসের নির্দেশ:

لا تغدروا ولا تمثلواولا تقتلوا وليداً ولا اصحاب الصوامع ... ولا راهبا ... ولا امرأةً ولا شيخاً كبيراً ... ولا تذبحوا بغيراً ولا بقرةً الا لمأكل ... ولا تخربوا عمراناً ولا تقطعوا شجرة الا لنفع ...وأحسنوا ان الله يحب المحسنين

"যুদ্ধে তোমরা প্রতারণা বা ধোঁকার আশ্রয় নেবে না, চুক্তিভঙ্গ করবে না, কোনো মানুষ বা প্রাণীর মৃতদেহ বিকৃত করবে না বা অসম্মান করবে না, কোনো শিশু-কিশোরকে হত্যা করবে না, কোনো

মহিলাকে হত্যা করবে না, কোনো গীর্জাবাসী, সন্ন্যাসী বা ধর্মযাজককে হত্যা করবে না, কোনো বৃদ্ধকে হত্যা করবে না, কোনো অসুস্থ মানুষকে হত্যা করবে না, কোনো বাড়িঘর ধ্বংস করবে না, খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া গরু, উট বা কোনো প্রাণী বধ করবে না, যুদ্ধের প্রয়োজন ছাড়া কোনো গাছ কাটবে না...। তোমরা দয়া ও কল্যাণ করবে, কারণ আল্লাহ দয়াকারী- কল্যাণকারীদেরকে ভালবাসেন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর জীবনের সকল যুদ্ধে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন যথাসম্ভব কম প্রাণহানি ঘটাতে। শুধু মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক ও যোদ্ধাদের জীবনই নয়, উপরন্তু তিনি শত্রুপক্ষের নাগরিক ও যোদ্ধাদেরও প্রাণহানি কমাতে চেয়েছেন। বস্তুত ইসলাম যুদ্ধকে যে মানবিক রূপ প্রদান করেছে তা অন্য কোনো ধর্মেই পাওয়া যায় না। উপর্যুক্ত শর্তাবলির বিদ্যমানতায় জিহাদ শরীয়ত সম্মত ইবাদতে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে জিহাদ আত্মরক্ষামূলক (defensive) হতে পারে। আবার তা আক্রমনাত্মক বা নিবৃত্তিমূলক (offensive/preemptive) হতে পারে। রাষ্ট্র প্রধান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

ইসলামের ইতিহাসে জিহাদ ও সন্ত্রাস

ইসলামের ইতিহাসে আমরা অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখতে পাই, যেগুলি যুদ্ধের ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসে উলি-খিত শর্তগুলি পুরোপুরি পূরণ করে না। এগুলি মানবীয় দুর্বলতার ফল। ইসলামের দৃষ্টিতে মূলত এগুলি অবৈধ। তবে কোনো ক্ষেত্রেই যুদ্ধের ময়দানের বাইরে গুপ্ত হত্যা, নির্বিচার হত্যা ইত্যাদিতে উপর্যুক্ত কয়েকটি বিভ্রান্ত দল ছাড়া কেউ জড়িত হন নি। পরবর্তীকালের দুটি 'জিহাদ' আমাদের আগ্রহ সৃষ্টি করে: (১) ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে (১৮১৮-১৮৩১খৃ) ভারতে বৃটিশ দখলদারদের বিরুদ্ধে সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর জিহাদ ও (২) আফগান জিহাদ। সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবী জিহাদের শর্তগুলি পূরণ করেছিলেন। তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যের সীমানার বাইরে ভারতের ইসলামী রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার ঘোষণার মাধ্যমে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রপ্রধানের শর্ত পূরণ করেছিলেন। তিনি বৃটিশদেরকে আক্রমণকারী ও দখলদার বাহিনী হিসেবে গণ্য করে জিহাদের বৈধতা প্রমাণ করেন।

আফগান জিহাদও শুরু হয়েছিল প্রায় একইভাবে। সোভিয়েট বাহিনীর আক্রমণ ও জবরদখলের মুখে আফগান জনগণ আলিমদের নেতৃত্বে জিহাদ শুরু করেছিলেন। সাধারণভাবে মুসলিম বিশ্বে এ জিহাদ বৈধ জিহাদ বলেই মনে করা হয়। ফলে বিভিন্ন দেশের অনেক মুসলিম যুবক এ জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন। সোভিয়েট বাহিনীর পরাজয়ের পরে এ জিহাদ আন্তঃদলীয় ও আন্তঃগোত্রীয় রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে পরিণত হয়। দীর্ঘদিন যুদ্ধে অভ্যস্ত আফগান জনগণ অস্ত্রের ভাষাতেই কথা বললেন স্বদেশীয় ও স্বধর্মীয় বিরোধীদের সাথে। প্রত্যেকেই নিজের কাজকে জিহাদ এবং প্রতিপক্ষকে ইসলামের শত্রু বলে দাবি করলেন। বাইরে থেকে আফগান যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদগণ স্বভাবতই কোনো না কোনো আফগান পক্ষে থেকে একই কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েন। অনেকে আফগান ত্যাগ করে নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এসব যুদ্ধ ফেরত সৈনিকদের অনেকের জন্য 'অস্ত্রের ভাষা' পরিত্যাগ করা কষ্টকর হয়ে যায়। এদের অধিকাংশই জিহাদের শর্তের চেয়ে জিহাদের ফযীলতের বিষয়েই বেশি জানতেন ও ভাবতেন। তারা নিজ দেশেও 'জিহাদী' পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করেন।

বাইবেলীয় জিহাদ বনাম ইসলামের জিহাদ - প্রথম অংশ

উপরে আমরা ইসলামী শরীয়তে জিহাদের পরিচয়, তার উদ্দেশ্য ও শর্তাবলি সম্পর্কে জানতে পেরেছি। আমরা জানি যে, ইসলাম বিরোধী সকল প্রচারণার মূল দাবি যে, ইসলামই ধর্মের নামে যুদ্ধ বৈধ করেছে। বিশেষত খৃস্টান ধর্মগুরুগণ খৃস্টধর্মকে ‘‘ভালবাসা ও মানবতার ধর্ম’’ ও ইসলামকে যুদ্ধ, সহিংসতা ও সন্ত্রাসের ধর্ম বলে চিত্রিত করেন। ইউরোপে মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে সন্ত্রাসী রূপে চিত্রিত করে কার্টুন ছাপা হচ্ছে এবং ‘‘কুরআন’’-কে সন্ত্রাসী গ্রন্থ বলে দাবি করে তা নিষিদ্ধ করতে দাবি জানানো হচ্ছে। ক্যাথলিক খৃস্টান জগতের বর্তমান ধর্মগুরু পোপ ১৬শ বেনিডিক্ট (Benedict XVI) ২০০৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর জার্মানির রিগেনসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক আলোচনায় বাইজানটাইন সম্রাট ম্যানুয়েল-২ এর ইসলামের প্রতি চরম বিদ্বেষমূলক নিম্নোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন: "Show me just what Mhuammad brought that was new and there you will find things only evil and inhuman, such as his command to spread by the sword the faith he preached." ‘‘তুমি আমাকে দেখাও তো, মুহাম্মাদ (ﷺ) নতুন কি এনেছেন? তরবারীর মাধ্যমে তার ধর্ম প্রচার করার নির্দেশের মত অমানবিক ও অশুভ বিষয় ছাড়া আর কিছুই তুমি পাবে না।’’

মানবতার জন্য মুহাম্মাদ (ﷺ) সত্যিই কী নতুন শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন সে বিষয়ে বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের সাথে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর শিক্ষার তুলনামূলক পর্যালোচনা করে ‘‘কী নতুন নিয়ে এলেন মুহাম্মাদ (ﷺ)’’ নামে একটি গ্রন্থ রচনার একান্ত ইচ্ছা রয়েছে। মহান আল্লাহর কাছে তাওফীক প্রার্থনা করছি। এখানে ‘‘জিহাদ’’ পরিভাষার অপব্যবহার বিষয়ে আলোচনার পূর্বে আমরা জিহাদের বিষয়ে বাইবেলের নির্দেশাবলি পর্যালোচনা করতে চাই, যেন আমরা অন্তত জিহাদ বিষয়ে মুহাম্মাদ (ﷺ) নতুন কী নিয়ে এসেছিলেন তা আমরা জানতে পারি।

এখানে উলে-খ্য যে, ইহূদী-খৃস্টানগণের মধ্যে প্রচলিত বাইবেলের ‘‘ভার্সনগুলির’’ মধ্যে ব্যাপক বৈপরীত্য ও অমিল রয়েছে। ইহূদী বাইবেলের সাথে খৃস্টান বাইবেলের অমিল রয়েছে। তেমনি ক্যাথলিক খৃস্টানগণের বাইবেলের সাথে প্রটেস্ট্যান্ট খৃস্টানগণের বাইবেলের অমিল রয়েছে। সর্বাবস্থায় আমরা মুসলিমগণ বিশ্বাস করি যে, প্রচলিত বাইবেল কখনোই আল্লাহর কিতাব নয়। এর মধ্যে তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জিল ইত্যাদি আসমানী গ্রন্থের কিছু অংশ থাকলেও তা পুরোহিতদের সংযোজন, বিয়োজন ও বিকৃতির সাথে সংমিশ্রিত হয়ে রয়েছে। যে সকল অমানবিক ও অশুভ বিষয় রয়েছে তা সবই এরূপ বিকৃত তথ্য।

তবে ইহূদী ও খৃস্টানগণ প্রচলিত এ বাইবেলকেই তাদের ধর্মগ্রন্থ ও আসমানী গ্রন্থ হিসেবে বিশ্বাস করেন। ইহদীগণ শুধু ‘পুরাতন নিয়ম’কেই ধর্মগ্রন্থ বলে বিশ্বাস করেন। আর খৃস্টানগণ বিশ্বাস

করেন যে, প্রচলিত বাইবেলের পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের প্রতিটি শব্দ, বাক্য ও কথাই আল্লাহর বাণী।
উপরন্তু তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বরের বাণী বা বিধান কখনো রহিত হতে পারে না। কাজেই বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের প্রতিটি বাণী ও বিধান কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য পালনীয় অলঙ্ঘনীয় নির্দেশ।
বাইবেল থেকে জানা যায় যে, জিহাদ বা যুদ্ধের জন্যই যীশুখৃস্ট আগমন করেছিলেন। তিনি বলেন: Think not that I am come to send peace on earth: I came not to send peace, but a sword "মনে করিও না যে, আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে আসিয়াছি; শান্তি দিতে আসি নাই, কিন্তু খড়্গ দিতে আসিয়াছি।"

উপরন্তু যীশুখৃস্ট তার রাজত্বের বিরোধীদেরকে তাঁর সামনে জবাই করতে নির্দেশ দিয়ে বলেন: "But those mine enemies, which would not that I should reign over them, bring hither, and slay them before me", "পরন্তু আমার এই যে শত্রুগণ ইচ্ছা করে নাই যে, আমি তাহাদের উপরে রাজত্ব করি, তাহাদিগকে এই স্থানে আন, আর আমার সাক্ষাতে বধ কর।" বাইবেলে সুস্পষ্টতই বলা হয়েছে যে, নেককার সাধু-সন্তদের মূল কাজ হলো আল্লাহর প্রশংসা করা এবং সর্বদা দু-ধারি তরবারী সাথে নিয়ে কাফির-বিধর্মীদের কতল করা ও শাস্তি দেওয়া। আর এভাবে কাফির-বিধর্মীদের হত্যা, বন্দী ও বিচার করাই সাধুদের মূল কর্ম ও মর্যাদা: "Let the saints be joyful in glory... Let the high praises of God be in their mouth, and a twoedged sword in their hand; To execute vengeance upon the heathen, and punishments upon the people; To bind their kings with chains, and their nobles with fetters of iron; To execute upon them the judgment written: this honour have all his saints. "সাধুগণ গৌরবে উল্লাসিত হউক। ... তাহাদের কণ্ঠে ঈশ্বরের উচ্চ প্রশংসা, তাহাদের হস্তে দ্বি-ধার খড়্গ থাকুক; যেন তারা বিধর্মী-কাফিরদের প্রতিফল দেয়, লোকবৃন্দকে শাস্তি দেয়; যেন তাহাদের রাজাগণকে, তাহাদের মান্যগণ্য লোকদিগকে লৌহ-নিগড়ে বদ্ধ করে; যেন তাহাদের বিরুদ্ধে লিখিত বিচার নিষ্পন্ন করে; ইহাই সমস্ত সাধুর মর্যাদা।"

বাইবেলের বিভিন্ন নির্দেশনা থেকে নারী, শিশু ও নিরস্ত্র মানুষদেরকে হত্যার ঢালাও অনুমোদন বুঝা যায়। যেমন বলা হয়েছে: "Kill every male among the little ones, and kill every woman that hath known man by lying with him. But all the women

children, that have not known a man by lying with him, keep alive for yourselves."

“অতএব তোমরা বালক-বালিকাদের মধ্যে সমস্ত বালককে বধ কর, এবং শয়নে পুরুষের পরিচয়প্রাপ্ত সমস্ত স্ত্রীলোককেও বধ কর; কিন্তু যে বালিকারা শয়নে পুরুষের পরিচয় পায় নাই, তাহাদিগকে আপনাদের জন্য জীবিত রাখ।”

গণহত্যা ও বিধর্মী হত্যার উপর্যুক্ত নির্দেশাবলি বাইবেলের পুরাতন নিয়মের কথা বা তাওরাতের কথা, ইঞ্জিলের কথা নয়। আমরা আগেই বলেছি যে, খৃস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, পুরাতন ও নতুন নিয়মের প্রতিটি শব্দই আল্লাহর বাণী এবং কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য পালনীয়। তাঁরা আরো বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর কোনো নির্দেশ বা বাণী কখনো “নসখ” বা রহিত হতে পারে না। সর্বোপরি স্বয়ং যীশু খৃস্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে পুরাতন নিয়মের সকল নির্দেশ চিরন্তন, অপরিবর্তনীয় ও অলঙ্ঘনীয় ঐশ্বরিক নির্দেশ যা কিয়ামত পর্যন্ত সকল খৃস্টানের জন্য পালনীয় এবং এগুলি পালন না করলে কেউ পরকালে মুক্তি লাভ করতে পারবে না। তিনি বলেন

"For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven".

“আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে পর্যনত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সেই পর্যনত ব্যবস্থার (তাওরাত বা পুরাতন নিয়মের বিধিবিধান) এক মাত্রা কি এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না, সমস্তই সফল হইবে। অতএব যে কেহ এই সকল ক্ষুদ্রতম আজ্ঞার মধ্যে কোন একটি আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, ও লোকদিগকে সেইরূপ শিক্ষা দেয়, তাহাকে স্বর্গরাজ্যে অতি ক্ষুদ্র বলা যাইবে; কিন্তু যে কেহ সেই সকল পালন করে ও শিক্ষা দেয়, তাহাকে স্বর্গ-রাজ্যে মহান বলা যাইবে।”

এছাড়া আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, বাইবেলের নতুন নিয়মেও যীশু তাঁর রাজত্বের প্রতি অনীহা পোষণকারীদের তার সামনে হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, তরবারী বা যুদ্ধের জন্যই তাঁর আগমন।

বাইবেলে অন্য ধর্ম বা বর্ণের মানুষদেরকে শূকর, কুকুর ইত্যাদি বলে গালি দেওয়া হয়েছে। অ-ইস্রায়েলীয়দেরকে কুকুর ও শূকর আখ্যায়িত করে তাদেরকে খৃস্টান ধর্মের দীক্ষা দিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে যীশু বলেন:

"Give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine...",

“পবিত্র বস্তু কুকুরদিগকে দিও না, এবং তোমাদের মুক্তা শূকরদের সম্মুখে ফেলিও না”

অ-ইস্রায়েলীয়দেরকে কুকুর আখ্যায়িত করে তাদের জন্য দুআ করতে বা তাদেরকে ঝাড়-ফুঁক দিতেও আপত্তি করেন যীশু খৃস্ট। মথি তাঁর সুসমাচারে লিখেছেন:

"And, behold, a woman of Canaan came out of the same coasts, and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou Son of David; my daughter is grievously vexed with a devil. But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away; for she crieth after us. But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, It is not meet to take the children's bread, and to cast it to dogs."

"আর দেখ, ঐ অঞ্চলের এক জন কনানীয় স্ত্রীলোক আসিয়া এই বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল, হে প্রভু, দায়ূদ-সনতান, আমার প্রতি দয়া করুন, আমার কন্যাটি ভূতগ্রস্ত হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছে। কিন্তু তিনি তাহাকে কিছুই উত্তর দিলেন না। তখন তাঁহার শিষ্যেরা নিকটে আসিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, ইহাকে বিদায় করুন, কেননা এ আমাদের পিছনে পিছনে চেঁচাইতেছে। তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, ইস্রায়েল-কুলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই। কিন্তু স্ত্রীলোকটি আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, প্রভু, আমার উপকার করুন। তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, সনতানদের খাদ্য লইয়া কুকুরদের কাছে ফেলিয়া দেওয়া ভাল নয়।"

বাইবেলীয় জিহাদ বনাম ইসলামের জিহাদ - দ্বিতীয়/শেষ অংশ

প্রথম দৃষ্টিতেই যে কোনো পাঠকের কাছে কথাগুলি খুবই আপত্তিকর মনে হবে। জন্ম, বংশ বা ধর্মের কারণে মানুষকে কুকুর বলে অভিহিত করা! শুধুমাত্র বংশ বা ধর্মের কারণে তাকে মানবিক সাহায্য করতে অস্বীকার করা!! একজন খৃস্টধর্ম বিরোধী পাঠক দাবি করতে পারেন যে, এ বক্তব্য দ্বারা জাতিগত বৈষম্য ও জাতিগত বিদ্বেষ চিরস্থায়ী করা হয়েছে। তিনি দাবি করতে পারেন যে, বাইবেলের উপর্যুক্ত সকল গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের মূল দর্শন যীশুর এ কথার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। কেউ এ দাবীও করতে পারেন যে, বর্তমান যুগে ফিলিস্তিন, ইরাক ও অন্যান্য দেশে গণহতা ও ধ্বংসযজ্ঞের বিষয়ে পোপ কোনো প্রতিবাদ না করে ইসলামের নবীর সমালোচনা করছেন এর কারণও এ 'কুকুর' দর্শন। যে দর্শনের মূল হলো, ইহূদীখৃস্টানগণ ঈশ্বরের সন্তান। অন্য সকল মানুষ কুকুরের মতই মানবেতর প্রাণী। কুকুরকে যেমন পচা বা ছেড়া রুটির টুকরো ছুড়ে দেওয়া যায়, তেমনি এদেরকে মাঝে মাঝে কিছু সাহায্য করা যেতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরের সন্তানদের স্বার্থের ক্ষতি করে তাদের কোনো উপকার করা যাবে না। যদি ঈশ্বরের সন্তানদের স্বার্থের ক্ষতি হয় তবে লক্ষকোটি সারমেয় সন্তানকে নির্বিচারে হত্যা করতে কোনো অসুবিধা নেই। এছাড়া ঈশ্বরের সন্তানগণ যদি কিছুটা আনন্দ ও তৃপ্তি লাভের জন্য দুচার হাজার বা দুচার লক্ষ সারমেয় সন্তানকে হত্যা করে ফেলেন তাতেও অসুবিধা কী?

বাইবেলে অন্যধর্মের অনুসারীদের ঠান্ডামাথায় হত্যার নির্দেশনা, এমনকি প্রতারণামূলকভাবে ডেকে এনে হত্যা করার নির্দেশনা রয়েছে। একটি ঘটনা দেখুন। ইহূদীদের প্রাচীন রাষ্ট্র ''ইসরায়েলের'' কিছু নাগরিক ''বাল'' দেবতার উপাসনা করত। ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র ইস্রায়েলের সম্রাট যেহূ (Jehu, the son of Jehoshaphat) ঈশ্বরের সঠিক ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য ''বাল'' দেবতার উপাসকদের ঠান্ডা মাথায় গণহত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ঘোষণা দেন যে, সম্রাট যেহূ বাল দেবতার সেবা করবেন। এ জন্য তিনি বাল দেবতার উপাসকদের এক মহা- সমাবেশের আয়োজন করেন। সেখানে তিনি দেবতার উদ্দেশ্যে ভেট ও উৎসর্গের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু গোপনে উৎসবকেন্দ্র ও মন্দিরের চারিপাশে সেনাবাহিনী নিয়োগ করে উৎসবরত সকল ''বিধর্মী''-কে তরবারীর আঘাতে হত্যা করতে নির্দেশ দেন। এমনকি তিনি তাঁর সৈন্যদের বলেন, যদি একজন বিধর্মীও জীবন নিয়ে পালায় তবে তার বিনিময়ে একজন সৈন্য হত্যা করা হবে। এভাবে হাজার হাজার নিরীহ নিরস্ত্র নারী-পুরুষকে কেবলমাত্র ধর্মীয় বিরোধিতার কারণে কোনোরূপ সুযোগ না দিয়ে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করেন।

অন্য ঘটনায় বাইবেলীয় নবী এলিজাহ (Prophet Elijah) বাল দেবতার ৪৫০ জন উপাসককে ধরে ঠান্ডা মাথায় জবাই করেন।

এ সকল ঘটনা থেকে খৃস্টান পোপ, পাদরী ও বিশপগণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, খৃস্টান দেশে বসবাস রত সকল অখৃস্টান নাগরিক এবং ভিন্নমতাবলম্বী খৃস্টানদেরকে হত্যা ও নির্মূল করা তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব ও অধিকার। প্রসিদ্ধ আরব প্রটেস্ট্যান্ট পাদরি আইজাক বাদারকান ১৮৪৯ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত তার লেখা "পুস্তিকা ত্রয়োদশ" গ্রন্থে লিখেছেন: রোম থেকে আরবী ভাষায় প্রকাশিত বাইবেল ইনডেক্সের "হা" অক্ষরের মধ্যে "হারতাকা" (heresy) বিষয়ে লেখা হয়েছে: "ধর্মীয় ভিন্নমতাবলম্বী বা বিদআতী ফিরকার (heretics) বিষয়ে আমাদের দায়িত্ব হলো তাদের নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন করা; কারণ সম্রাট যেহূ প্রতারণার মাধ্যমে বাল দেবতার অনুসারীদের জমায়েত করে হত্যা করেছেনা এবং নবী এলিজাহ বাল দেবতার অনুসারীদের জবাই করেছেন। এথেকে প্রমাণিত হয় যে, বিধর্মীদের এভাবে হত্যা ও নির্মূল করা আমাদের ধর্মীয় দায়িত্ব।

খৃস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার প্রেরণায় "পোপ" নিষ্পাপ, নির্ভুল ও অভ্রান্ত (infallible) । তাঁর সিদ্ধান্তই ঈশ্বরের সিদ্ধান্ত। আর এরূপ অভ্রান্ত পোপগণের নেতৃত্বে খৃস্টধর্ম ও খৃস্টীয় চার্চ বিধর্মী নির্মূলের এ মহান দায়িত্ব সর্বোত্তমভাবেই পালন করেছেন। ৩২৫ খৃস্টাব্দে বাইজান্টাইন সম্রাট কন্সাটনাইন (Constantine) খৃস্টধর্মকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান করেন। সেদিন থেকে প্রায় দেড় হাজার বৎসর পর্যন্ত খৃস্টধর্মের ইতিহাস ধর্মীয় সহিংসতা, হত্যা, অত্যাচার ও জোরপূর্বক ধর্মান্তরের ইতিহাস। "শূন্য সহনশীলতা" প্রদর্শন করে কঠোর বর্বরতার সাথে খৃস্টান চার্চ সকল বিধর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বীকে নির্মূল করেছে। আর এজন্যই নোবেল বিজয়ী প্রসিদ্ধ দার্শনিক বাট্রান্ড রাসেল (Bertrand Russell: 1872-1970) বলেন:

"You find as you look around the world that every single bit of progress in human feeling, every improvement in the criminal law, every step towards the diminution of war, every step towards better treatment of coloured races, or every mitigation of slavery, every moral progress that there has been in the world, has been consistently opposed by the organized Churches of the world. I say quite deliberately that the Christian religion, as organized in the churches, has been and still is the principal enemy of moral progress in the world.

"বিশ্বের চারিদিকে তাকালে আপনি দেখবেন যে, বিশ্বের যেখানেই মানবীয় অনুভবের যে কোনো ক্ষুদ্রতম অগ্রগতি, অপরাধআইনের যে কোনো উন্নয়ন, যুদ্ধ হ্রাসে যে কোনো পদক্ষেপ, কাল বা

অ-সাদা বর্ণের মানুষদের সাথে উন্নততর আচরণের ক্ষেত্রে যে কোনো পদক্ষেপ, দাসপ্রথা বিলুপ্তির যে কোনো প্রচেষ্টা এবং নৈতিক উন্নয়ন যে কোনো অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তারই বিরোধিতা করেছে খৃস্টীয় চার্চ নিরবিচ্ছিন্নভাবে। আমি পরিপূর্ণ সতর্কতা ও সুচিন্তিতভাবে বলছি যে, চার্চ পরিচালিত খৃস্টধর্মই বিশ্বের নৈতিক উন্নয়নের প্রধান শত্রু ছিল এবং এখনো আছে।"

Vlasis Rassias নামক একজন গবেষক (Demolish Them) নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেছেন গ্রীক ভাষায় ২০০০ খৃস্টাব্দে (ISBN 960-7748-20-4) । এ পুস্তকে খৃস্টধর্মের সহিংসতার অনেক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এ সকল সহিংসতার তালিকায় রয়েছে:

Emperor Constantine began a centuries-long run of torture, destruction and extermination of all things not Christian like eradicating ancient Greek temples and stealing their treasures. Subsequent Roman Emperors in Constantinople executed everyone that did not accept the new Christian faith. Then libraries were burned and all contrary teachings outlawed....

For another thousand years, the primary occupation of state-sanctioned Christians was to exterminate those who would not accept the documents constructed into a Bible at the Council of Nicea. In 1493, Spanish monarchs Ferdinand and Isabella issued an edict demanding death for all those who would not accept 'the true faith'. Christopher Columbus and others began slaughtering natives of the Western Hemisphere by the millions, not because the would not accept the faith, but because they could not understand the question, because they could not speak Spanish!"

"খৃস্টান বিশ্বাসের পরিপন্থী সকল কিছুর বিরুদ্ধে সম্রাট কনস্টান্টাইন এক নিপীড়ন, ধ্বংসযজ্ঞ ও নির্মূল অভিযানের শুরু করেন যা শতাব্দীর পর শতাব্দী স্থায়ী হয়। যেমন প্রাচীন গ্রীক মন্দিরগুলি ধ্বংস করা হয় এবং সেগুলির ভান্ডার লুণ্ঠন করা হয়। নতুন খৃস্টীয় ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করতে রাজি নয় এমন সকলকে নির্মূল করেন কন্সটান্টিনোপলের পরবর্তী রোমান শাসকগণ। এরপর লাইব্রেরীগুলি পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং খৃস্টীয় বিশ্বাসের বিপরীত সকল কিছু নিষিদ্ধ করা হয়। ...নিকীয়া কাউন্সিলে যে বাইবেল তৈরি করা হয় সে বাইবেল যারা মানে না তাদেরকে নির্মূল করাই ছিল পরবর্তী হাজার বৎসর যাবৎ রাষ্ট্র পরিচালিত খৃস্টানগণের মূল কর্ম।

১৪৯৩ খৃস্টাব্দে স্পেনের সম্রাট ফার্ডিনান্ড ও রাণী ইসাবেলা এক আদেশ জারি করেন যে, যারা 'সঠিক ধর্ম বিশ্বাস' (খৃস্টধর্ম) গ্রহণ করবে না তাদেরকে হত্যা করতে হবে। (এ আজ্ঞার ভিত্তিতে) ক্রিস্টোফার কলম্বাস ও অন্যান্যরা আমেরিকায় যেয়ে সেখানকার মিলিয়ন মিলিয়ন বাসিন্দাকে (রেড ইন্ডিয়ান) হত্যা করেন। খৃস্টধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকার করার কারণে তারা তাদেরকে হত্যা করেননি। বরং স্প্যানিশ ভাষা না জানায় তারা খৃস্টধর্মের বিশ্বাস বুঝতে পারছিল না। এ অপরাধে তারা তাদেরকে হত্যা করেন।"

শুধু মুসলিম, ইহূদী বা অখৃস্টানদের বিরুদ্ধেই নয়, ভিন্নমতাবলম্বী খৃস্টানদের বিরুদ্ধেও ক্রুসেড চালিয়েছেন খৃস্টান ধর্মগুরু পোপগণ এবং একেক যুদ্ধে লক্ষাধিক মানুষ হত্যা করেছেন। আপনারা যে কোনো এনসাইক্লোপীডিয়াতে ক্রুসেড, এ্যালবিজেনসিয়ান ক্রুসেড (the Albigensian Crusade), সেন্ট বার্থলমিউস দিবসের গণহত্যা (Massacre of Saint Bartholomew's Day), ইনকুইজিশন, ধর্মের যুদ্ধ, ইহূদী বিরোধিতা ইত্যাদি আর্টির্কেল পড়লেই অনেক তথ্য জানতে পারবেন। যদিও আধুনিক গ্রন্থগুলিতে বিষয়গুলিকে খুবই হালকা করা হয়, নিহতদের সংখ্যা কম করা হয় এবং "ধর্ম" ও "চার্চ"-কে বাঁচিয়ে অন্যদের উপর দায় চাপানোর চেষ্টা করা হয়। তারপরও যেটুক সত্য দেখবেন তাতেই গায়ের লোম শিউরে উঠবে! একেক যুদ্ধ বা হত্যাকান্ডে ১০/২০ হাজার থেকে লক্ষাধিক মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। কখনো যুদ্ধ করে এবং কখনো যুদ্ধ ছাড়াই অতর্কিত হামলা চালিয়ে।

এ হলো ইহূদী-খৃস্টানদের একেকটি ধর্মযুদ্ধের বা ধর্মীয় হত্যাকান্ডের অবস্থা। এ সকল বর্বরতা কখনো খৃস্টান সম্রাটশাসকগণের নেতৃত্বে ঘটেছে এবং পোপগণ তা সমর্থন করেছেন। কখনো স্বয়ং পোপের নেতৃত্বে এরূপ বর্বর নিধনযজ্ঞ শুরু হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আমি পাঠককে আমার লেখা (Jihad of the Holy Bible and Jihad of Muhammad (ﷺ)) গ্রন্থটি পাঠ করতে অনুরোধ করছি।

আধুনিক যুগের ধর্মনিরপেক্ষ (!) ও উদার (!) খৃস্টান বুদ্ধিজীবি ও রাজনৈতিক নেতাদের কথবার্তার মধ্যেও আমরা উপরের মানসিকতার ছায়া দেখতে পাই। আমেরিকার টুইন টাওয়ার ধ্বংসের জন্য আল-কায়েদাকে দায়ী করা হলেও এখন পর্যন্ত মার্কিন প্রশাসন নিজের দেশের আদালতেও তা প্রমাণ করতে পারেন নি। তা সত্ত্বেও "আল-কায়েদার" অপরাধের জন্য সকল মুসলিম দেশ দখল করে নেতাদের হত্যা ও মুসলমানদের জোরপূর্বক খৃস্টান বানানোর দাবিদাওয়া জানাচ্ছেন তাদের অনেকেই। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ মার্কিন সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবী কলামিস্ট অ্যান কাল্টার এর বক্তব্য আমরা ইতোপূর্বে উদ্ধৃত করেছি।

‘দ্যা সেভেইজ ন্যাশনস’ নামক রেডিও শোতে (১২ মে ২০০৩) প্রচারিত মাইকেল সেভেইজের মতামত পশ্চিমা দেশে বিশেষ করে আমেরিকায় প্রতিদিন পুনরাবৃত্তি করা হয়। তিনি তার শোতে বলেন: ‘‘আমার মনে হয় এই লোকগুলোকে (আরব ও মুসলমানদেরকে) জোর করে খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা উচিত। শুধুমাত্র এভাবেই সম্ভবত তাদেরকে মানুষে পরিণত করা যাবে।’’[5] এভাবে আরো অনেক প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য উদার, পরমতসহিষ্ণু ও ধর্মনিরপেক্ষ (?!) রাজনীতিবিদ, ধর্মপ্রচারক ও গবেষক মুসলমানদেরকে জোরপূর্বক খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছেন! আরেক মার্কিন সিনেটর দাবি করলেন যে, আমেরিকায় যে কোনো সন্ত্রাসী হামলা হলে বুঝতে হবে যে, তা মুসলিমগণ করেছে এবং কোনো প্রমাণ ছাড়ায় সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশোধ হিসেবে মুসলিমদের পবিত্র স্থান মক্কা ও মদীনা ধ্বংস করে দিতে হবে। আর এধরনের বুদ্ধিজীবি ও রাজনীতিবিদগণ ক্রমান্বয়ে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব লাভ করছেন।

অথচ মুসলিম মানস এমনভাবেই তৈরি যে, সে কখনোই অন্য মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার বা কাউকে জোর পূর্বক ধর্মান্তরিত করার কথা চিন্তাও করতে পারে না। আমরা দেখছি যে, সবচেয়ে সহিংস মুসলিম সন্ত্রাসীও অন্যের ধর্মকে অবমাননা করার চেষ্টা করছে না বা অন্য ধর্মের মানুষকে জবরদস্তিকরে মুসলিম বানানোর আহবান করছে না। সুসভ্য, মানবতাবাদী ও যুক্তিবাদী ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ খৃস্টানগণ মুসলিমদের পবিত্র কুরআনকে অপবিত্র করেছে। মানবতাবাদী ও ভালবাসার প্রচারক (?!) খৃস্টান পাদরিগণ কুরআনকে টয়লেটে নিক্ষেপ করার দাবি সম্বলিত ফলক চার্চের সামনে টানিয়ে রাখছেন। তারা মুসলিমদের পবিত্র নবীকে (ﷺ) নিয়ে ঘৃণ্য কার্টুন তৈরি করেছে।

সারা বিশ্বের মুসলিমগণ এ ঘৃণ্য বর্বরতার প্রতিবাদ করেছেন। তাঁরা মার্কিন বা ডেনিশ পতাকায় অথবা এ সব দেশের রাজনীতিবিদদের কুশপুত্তলিকায় অগ্নিসংযোগ করেছেন। কিন্তু কখনোই কোনো মুসলিম খৃস্টানদের ধর্মগ্রন্থের অবমাননা করেননি। বাজার থেকে একটি বাইবেল কিনে তাতে পেশাব করেননি বা তাতে অগ্নি সংযোগ করেননি বা যীশু খৃস্টের অবমাননাকর কার্টুন প্রচার করেননি। পাশ্চাত্যের সুসভ্য ধর্মনিরপেক্ষ মানুষদের দৃষ্টিতে একেবারে অশিক্ষিত, অসভ্য ও উগ্র কোনো মোল্লাও কখনো খৃস্টানদের ধর্মগ্রন্থকে অপবিত্র করতে বা যীশু নামে কার্টুন তৈরি করতে আহবান করেননি। পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে সন্ত্রাসী ও উগ্র মৌলবাদীদের একজনকেও আমরা দেখছি না যে, সে খৃস্টানদেরকে জোরপূর্বক মুসলিম বানানোর জন্য আহবান জানাচ্ছে। তারা হয়ত মি. বুশকে হত্যার আহবান করছে। কিন্তু তা তার খৃস্টান হওয়ার কারণে নয়, আমেরিকান হওয়ার কারণে নয় বা গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের সেবক হওয়ার কারণে নয়, বরং তাকে আগ্রাসক, জালিম ও হত্যাকারী বলে মনে করার কারণে। একই কারণে তারা হয়ত আমেরিকা বা ইস্রাইলের

ধ্বংসের জন্য আহবান করছে। কিন্তু কখনোই তারা কোনো ইহূদী বা খৃস্টানকে জোরপূর্বক মুসলিম বানানোর জন্য আহবান করছে না।

৩. ৭. ২. জিহাদ ফরয আইন এবং বড় ফরয

নিজের জীবনের চেয়ে অন্যের জীবনে দীন প্রতিষ্ঠার আবেগে প্রাচীন ও আধুনিক খারিজীগণ "জিহাদ" নামক ইবাদতকে "ফরয আইন" বা ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয বলে দাবি করেছেন। উপরন্তু তারা "জিহাদ"-কে মুমিনের জীবনের সবচেয়ে বড় ফরয বলে দাবি করেছে। প্রাচীন খারিজীগণের মতামত বর্ণনায় একজন গবেষক লিখেছেন:

"The second principle that flowed from their aggressive idealism was militancy, or jihād, which the Khawārij considered to be among the cardinal principles, or pillars, of Islām. Contrary to the orthodox view, they interpreted the Qurānic command about 'enjoining good and forbidding evil' to mean the vindication of truth through the sword"... "To these five, the Khawārij sect added a sixth pillar, the jihād".

"খারিজীদের আগ্রাসী আদর্শবাদের দ্বিতীয় ভিত্তি ছিল জিহাদ।

খারিজীগণ জিহাদকে ইসলামের মূল ভিত্তি বা রুকন বলে মনে করে। সাধারণ মুসলিমদের মতের বিপরীতে খারিজীগণ কুরআন নির্দেশিত 'সৎকাজে আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ' বলতে তরবারীর জোরে সত্য প্রতিষ্ঠা বুঝাতো।... তারা ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের সাথে জিহাদকে ষষ্ঠ স্তম্ভ হিসেবে যুক্ত করে...।"আবেগী খারিজীগণ সর্বদা জিহাদের অতুলনীয় সাওয়াব ও গুরুত্ব বিষয়ক আয়াতগুলিকে তাদের মতের পক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করত। তাদের উদ্ধৃত আয়াত ও হাদীস জিহাদের গুরুত্ব প্রমাণ করে। কিন্তু কখনোই তাকে সর্বোচ্চ বা সর্বশ্রেষ্ঠ ফরয বলে প্রমাণ করে না। প্রকৃত কথা যে, ইসলামে মুসলিমের উপর অনেক কর্ম ফরয করা হয়েছে। সকল ফরয কর্মই গুরত্বপূর্ণ। তবে সেগুলির মধ্যে কোনোটির চেয়ে কোনোটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। গুরুত্বের বেশিকম সাধারণভাবে সকলের জন্য হতে পারে আবার ব্যক্তিগত অবস্থার কারণে হতে পারে। সর্বাবস্থায় গুরুত্বের কমবেশি আবেগ বা যুক্তি দিয়ে নয়, বরং 'সুন্নাতের' আলোকে বা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আজীবনের কর্ম, শিক্ষা ও আচরণের মধ্য থেকে বুঝতে হবে। আর কুরআন, হাদীস এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের আচরিত প্রায়োগিক সুন্নাতের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, জিহাদ সবচেয়ে ফরয নয়, দীনের রুকনও নয় এবং ফরয আইনও নয়। বরং জিহাদ ফরয কিফায়া ইবাদত। আমরা ইতোপূর্বে বিষয়টি আলোচনা করেছি।

৩. ১১. ১. ৫. জঙ্গিবাদ বনাম ইসলামবাদ

আরো বেশি ভয়ঙ্কর বিষয় জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণের নামে ইসলামী দাওয়াতের কণ্ঠরুদ্ধ করা। মাওবাদী সন্ত্রাসীগণ বা আমাদের দেশের চরমপনহী বলে কথিত ''বামপন্থী জঙ্গিগণ'' যে মতাদর্শ ও দাবিদাওয়া প্রচার করেন মূলধারার মার্কসবাদী, সাম্যবাদী, সমাজতন্ত্রী বা বামপন্থীগণও একই মতাদর্শ ও দাবিদাওয়া প্রচার করেন। অনুরূপভাবে ইসলামের নামে উগ্রতায় লিপ্ত বা জঙ্গিবাদীরা যে সকল মতাদর্শ ও দাবি দাওয়া পেশ করেন প্রায় একইরূপ মতাদর্শ ও দাবি দাওয়া প্রচার করেন মূলধারার ইসলমী রাজনীতিবিদ, আলিম, শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ ও পীর-মাশাইখগণ। পার্থক্য হলো কর্মপদ্ধতিতে। চরমপন্থী ও জঙ্গিরা বলপ্রয়োগ, আইন অমান্য ও খুনখারাপির মাধ্যমে তাদের আদর্শ চাপিয়ে দিতে চান। পক্ষান্তরে মূলধারার মানুষেরা দেশের আইনের আওতায় গণতান্ত্রিক অধিকারের মধ্যে নিজেদের দাবি-দাওয়া পেশ করেন। গ্রহণ করা বা না করা জনগণের ইচ্ছাধীন।

সাম্যবাদী জঙ্গি বা সমাজতন্ত্রী সন্ত্রাসীদের কারণে কেউ মূলধারার সাম্যবাদী বা সমাজতন্ত্রীদেরকে দায়ী করেন না বা ''চরমপন্থা'' দমনের নামে বামপন্থী রাজনীতি ও কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করার দাবি তোলেন না। কেউ বলেন না যে, সাম্যবাদী রাজনীতির কারণেই চরমপন্থী ও সন্ত্রাসী জন্ম নিচ্ছে; কাজেই সাম্যবাদী রাজনীতি বন্ধ করা হোক। কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে অনেক সময় বিষয়টি সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে যায়। জঙ্গিবাদ দমনের অযুহাতে অনেক সময় ইসলামী রাজনীতি, ইসলামী আইন ও বিচার প্রতিষ্ঠার দাবি বা ইসলামী মূল্যবোধ বিকাশের দাবি বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়।

অনেক সময় ''ধর্মনিরপেক্ষতার'' নামে বা ''জঙ্গি'' নির্মূল করার নামে ''ইসলামী রাজনীতি'' বা ইসলামী মূল্যবোধ প্রসারমূলক কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণের দাবি করা হয়। অথচ ধর্মনিরপেক্ষতার মূল দাবী হলো সকল ধর্মের মানুষকে তার ধর্ম পালন ও ধর্মের বিষয়ে তার নিজের ব্যাখ্যা ও মতবাদ প্রচারের সুযোগ দেওয়া। গ্রহণ করা বা না করা জনগণের ইচ্ছা। গণতান্ত্রিক অধিকারের আওতায় মতপ্রকাশের অধিকার দিলে উগ্রতার পথ রুদ্ধ হয়। অতীতে কোনোকোনো দেশে সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি নিষেধ করার ফলে সমাজতান্ত্রিক জঙ্গিবাদের উন্মেষ ঘটে। পরবর্তীতে মূলধারায় সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির সুযোগ দেওয়ার ফলে ''সর্বহারার রাজত্বের'' জন্য বা সাম্যবাদের নামে সন্ত্রাস ক্রমান্বয়ে কমে যায়।

বস্তুত, গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় এক দল আরেক দলের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে পারেন। যারা ইসলামী মূল্যবোধ, আখলাক-আচরণ, শিক্ষা ইত্যাদি সবকিছুকেই ''আফিম'', ''প্রতিক্রিয়াশীলতা'' বা উন্নয়নের প্রতিবন্ধক বলে বিশ্বাস করেন, অথবা তাদের বাণিজ্যিক, সাম্রাজ্যবাদী বা অনুরূপ স্বার্থের প্রতিবন্ধক বলে মনে করেন তারা জঙ্গিবাদের অযুহাতে ইসলামী

শিক্ষা ও মূল্যবোধ বিস্তারের বা ইসলামী আদর্শ বিস্তারের সকল কর্ম নিষিদ্ধ করার দাবি করতে পারেন। মত প্রকাশের অধিকার তাদের আছে।

অনুরূপভাবে ''ইসলামপন্থীরা'' চরমপন্থা নির্মূল বা অনুরূপ কোনো অযুহাতে সাম্যবাদী বা সমাজতন্ত্রী আদর্শ প্রচার নিষিদ্ধ করার দাবি করতে পারেন। মত প্রকাশের অধিকার তাদের আছে। তবে সরকার ও প্রশাসনকে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে। তাদের নিজস্ব কোনো মত বা পক্ষ থাকলেও সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার পর তাদের দায়িত্ব হয় সকলের অধিকার রক্ষা করা এবং দেশের স্বার্থ সমুন্নত রাখা। আমাদের বুঝতে হবে যে, ভাল বা মন্দ কোনো কথারই ''কণ্ঠ'' রুদ্ধ করার প্রবণতা কখনোই ভাল ফল দেয় না। বিশেষত জঙ্গিবাদের নামে ইসলামী রাজনীতি, ইসলামী আদর্শ প্রচার, শিক্ষা বিস্তার ও ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার আইনসম্মত দাওয়াতকে নিষিদ্ধ বা বাধাগ্রস্ত করলে তা নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হরণের অপরাধ ছাড়াও দেশ ও জাতির জন্য ভয়ঙ্কর বিপদ দেকে আনবে। এ জাতীয় যে কোনো কর্ম জঙ্গিদেরকে সাহায্য করবে, তাদের প্রচার জোরদার করবে, তাদের নতুন রিক্রুটমেন্ট দ্রুত বাড়বে এবং দেশ ও জাতিকে এক ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী অশান্তির মধ্যে ফেলে দিবে।

৩. ১১. ১. ৬. ধর্ম-মুক্ত শিক্ষা বনাম ধর্ম-যুক্ত শিক্ষা

আমরা দেখেছি যে, ধর্মীয় আবেগের সাথে সঠিক ধর্মীয় জ্ঞানের অনুপস্থিতিই জঙ্গিবাদের মূল কারণ। এজন্য সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় অধিকতর ইসলামী ও নৈতিক শিক্ষার সংযোজন অতীব প্রয়োজনীয়। জঙ্গিবাদের অযুহাতে মাদ্রাসা শিক্ষা সংকোচন এবং সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে ''ধর্মনিরপেক্ষ'' বা ''অসামপ্রদায়িক'' করার নামে ধর্মীয় শিক্ষা থেকে বিমুক্ত করা আন্তজার্তিক বেনিয়াচক্র ও সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনলেও জাতির জন্য ভয়ঙ্কর দুর্ভাগ্যের দ্বার উন্মোচন করবে।

''মাদ্রাসা-শিক্ষিত'' ও ধার্মিক মানুষেরা জঙ্গি না হলেও তারা সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ ও আগ্রাসন বিরোধী এবং অশ্লীলতা, মাদকতা ও অনাচার বিরোধী। জঙ্গিবাদের অযুহাতে এদেশের মানুষদের মধ্য থেকে সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ ও আগ্রাসন বিরোধী মানসিকতা অথবা অশ্লীলতা, মাদকতা ও অনাচার বিরোধী মানসিকতা নির্মূল করা যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয় তাহলে ভিন্ন কথা। আর যদি আমরা জাতির কল্যাণে জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণ করতে চাই তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই সঠিক ধর্মীয় শিক্ষার বিকাশ ঘটাতে হবে।

আমরা দেখছি যে, আমাদের দেশে ও বিশ্বের সকল দেশে জঙ্গি কর্মকান্ডে জড়িতদের অধিকাংশই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত। জঙ্গি বলে কথিত ও প্রচারিত অধিকাংশ দল ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও তাত্ত্বিক গুরুগণও আধুনির শিক্ষিত। কিভাবে এদের দলে নতুন অন্তর্ভুক্তি নিয়ন্ত্রণ করবেন? আমরা কি শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা দিব যে, ধর্ম ভাল নয়, ধর্ম আফিম, ধর্ম পালন করো না, পরকাল বিশ্বাস করো না, ধার্মিকদের কাছে যেও না? এরূপ শিক্ষা তো কোনোভাবেই দিতে পারব না। আর দিলেও তাতে কোনো লাভ হবে না। জঙ্গিবাদ কমবে না, বরং জঙ্গিদের প্রচারণার সুযোগ অনেক বাড়বে, ধর্ম বিপন্ন বলে তারা আরো অনেক মানুষকে দলে ভেড়াবে। উপরন্তু এরূপ শিক্ষা দুর্নীতি, সন্ত্রাস, এইডস, এসিড, যৌন হয়রানি, পারিবারিক সহিংসতা ও নৈতিক অবক্ষয়ের মহাদ্বার উন্মোচন করবে।

তাহলে কী আমরা ধর্ম সম্পর্কে কিছুই শিক্ষা দিব না? ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থার নামে কি আমরা ‘‘ধর্ম-মুক্ত’’ শিক্ষা দান করব? এতে তো আমাদের সমস্যা বাড়বে। কারণ এরূপ শিক্ষা শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় অনুভূতি নষ্ট করতে পারবে না, কিন্তু ধর্মীয় অজ্ঞতা তাদের ধর্মীয় অনুভূতির অপব্যবহারের সুযোগ বাড়িয়ে দেবে। বস্তুত ধর্মীয় অনুভুতি নির্মুল করা যায় না। সঠিক জ্ঞানের অভাবে তা বিপথগামী হয়। কখনো কুসংস্কার ও অনাচার এবং কখনো উগ্রতার পথ ধরে। কেউ ‘‘পাগল বাবা’’-র দরবারে ধর্না দিয়ে, মাজারে-দরগায় পাগল বা মস্তানের পিছনে ছুটে, গাঁজা খেয়ে, জিনের বাদশা বা অনুরূপ প্রতারক-পুরোহিতের কাছে যেয়ে মূল্যবান কর্মঘন্টা ও সম্পদ নষ্ট করে। আর কেউ উগ্রতা ও সহিংসতার পিছে ছুটে নিজের ও অন্যের মহামূল্যবান জীবন ও সম্পদ নষ্ট করে।

আমাদের দেশের ও পাশ্চাত্যের অনেক পন্ডিত ও রাজনৈতিক নেতা আমাদেরকে নীতি কথা শুনান এবং ‘‘দুর্নীতিমুক্তি’’ দেশ গড়তে নসীহত করেন। কিছুদিন পরে দেখা যায় যে, বড় বড় দুর্নীতি মামলায় তারা জড়িত। এর কারণ ধর্মীয় বিশ্বাস, আখিরাতমুখিতা ও আল্লাহর ভয় ছাড়া শুধুমাত্র নীতিকথা, নীতিশিক্ষা, প্রতিজ্ঞা বা অঙ্গীকার দিয়ে কখনোই দুর্নীতি, নৈতিক অবক্ষয়, সহিংসতা, মাদকতা বা অপরাধ প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

বস্তুত ‘‘ধর্ম-মুক্ত’’ শিক্ষাব্যবস্থা জঙ্গিবাদ না কমিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে জঙ্গিবাদে আক্রান্ত হওয়ার জন্য অধিক ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। পাশাপাশি অন্যান্য সকল প্রকারের দুর্নীতি, সহিংসতা ও অপরাধ বৃদ্ধিতে ব্যাপক সহায়তা করে। এজন্য জঙ্গিবাদসহ অন্যান্য সকল সন্ত্রাস, সহিংসতা, দুর্নীতি, মাদকতা, অপরাধ প্রবণতা ও নৈতিক অবক্ষয় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত পর্যাপ্ত ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন।

পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষার সম্প্রসারণ, আধুনিকায়ন ও ইসলামী ধর্মতত্ত্বে গভীর জ্ঞানী প্রাজ্ঞ গবেষক আলিম তৈরির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যেন তারা কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক মতামত প্রদানের মাধ্যমে যুবসমাজকে উগ্রতা থেকে রক্ষা করতে পারেন।

জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের সম্পৃক্তি

যেহেতু এ বিষয়টির সাথে ধর্মীয় অনুভূতি জড়িত সেহেতু এর প্রতিরোধ, প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ বা আলিমদের সম্পৃক্ত করা অতীব জরুরী। উগ্রতার প্রসারে ইসলামী শিক্ষার যে বিষয়গুলিকে বিকৃত করা হয় সেগুলির তাত্বিক বিশে¬ষণ ও পর্যালোচনার জন্য সমাজের প্রাজ্ঞ আলিমগণকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গণমাধ্যমে সুযোগ দেওয়া অতীব জরুরী। একজন রাজনৈতিক বা সামাজিক নেতা যদি বলেন ‘‘ইসলাম শান্তির ধর্ম... ইত্যাদি’’ তাতে সন্ত্রাসে লিপ্ত যুবক পরিতৃপ্ত বা ‘কনভিন্সড’ হবে না; তবে যদি একজন প্রাজ্ঞ নেককার আলিম এ বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করেন তাহলে তা হয়ত তাকে পরিতৃপ্ত বা ‘কনভিন্সসড’ করতে পারবে।

এতে যেমন সংশ্লিষ্ট অনেকে সংশোধিত হবে তেমনি নতুন অর্ন্তভুক্তি কমে যাবে। ইসলামের ধর্মীয় ব্যবস্থার মধ্যে আল্লাহ ব্যক্তি ও সমাজ সংশোধনের স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা রেখেছেন। এর অন্যতম হলো মসজিদ ও সালাতুল জুমুআ। জুমুআর খুতবা ও আলোচনা সাধারণভাবে মুমিনের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে। সকল ব্যক্তিগত ও সামাজিক অপরাধ ও অবক্ষয়ের ন্যায় জঙ্গিবাদ বা উগ্রতা রোধেও ইমামগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। এজন্য মসজিদগুলিতে যোগ্য ইমাম নিয়োগ দেওয়া এবং বিদ্যমান ইমামদের ধর্মীয় জ্ঞান ও যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। সরকার যদি নিয়ন্ত্রণের নামে ইমামদের কথা বলা বন্ধ করেন তাহলে তা কোনো ভাল ফল দিবে না; বরং উল্টো ফল দিবে। ইমামগণ যদি সামাজিক অন্যায়, অবক্ষয় ইত্যাদির বিরুদ্ধে কিছু না বলে শুধুই ফযীলত ও গল্পের ওয়ায করেন তাহলে জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণে কোনো লাভ হবে না। ইমামগণ যদি সমাজ বা সরকারের অন্যায়ের কোনো প্রতিবাদ না করে শুধু উগ্রতার নিন্দা করেন তাহলেও তা মানুষের মনে রেখাপাত করবে না। কেউ একপেশে কথা পছন্দ করেন না এবং তাতে প্রভাবিত হন না।

ইমামগণ যদি সামাজিক অন্যায়, অবক্ষয়, অশ্লীলতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সুন্নাত-সম্মত পদ্ধতিতে কথা বলেন, এগুলির বিরুদ্ধে আপত্তি ও প্রতিবাদের সুন্নাত-সম্মত পদ্ধতি জানিয়ে দেন, উগ্রতা, বলপ্রয়োগ, আইন অমান্য ও বিদ্রোহের কারণে মুমিন দুনিয়া ও আখিরাতে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং দীনী দাওয়াত কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিভিন্ন আঙ্গিকে তার তথ্যভিত্তিক আলোচনা করেন তাহলে তা খুবই ভাল ফল দিবে।

সঠিক দাওয়াত ও বিকৃতি রোধ

আমাদের দায়িত্ব, সকল প্রতিকূলতার মধ্যে দীনী দাওয়াতকে অব্যাহত রাখা এবং পাশাপাশি দীনের যে সকল শিক্ষা বিকৃত করে একজন মুমিনকে উগ্রতায় লিপ্ত করা সম্ভব সেগুলির সঠিক চিত্র মুসলিম উম্মাহর কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করা। আমরা এ গ্রন্থে আমাদের সীমিত যোগ্যতা ও সীমিত জ্ঞানের আলোকে এ বিষয়ক কিছু তথ্য উল্লেখ করেছি। আশা করছি, যোগ্য ও প্রাজ্ঞ আলিমগণ এগুলির ভুলভ্রান্তি সংশোধন করে এ বিষয়ে আরো উন্নত গবেষণা উম্মাতের জন্য পেশ করবেন।

শেষকথা

বর্তমান গবেষণাটি "জিহাদ" নামক ইসলামিক পরিভাষাটির বহুল প্রচলিত অপপ্রচার এবং ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত এর প্রকৃত ও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বিদ্যমান বিশাল ব্যবধান উন্মোচন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল। গবেষণায় দেখা গেছে যে, জিহাদের মূল শাব্দিক অর্থ "প্রচেষ্টা" বা "সংগ্রাম", যা মানুষের অস্তিত্বের প্রতিটি স্তরে — ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক — প্রযোজ্য।

আমরা দেখেছি যে, ইসলামি দর্শন অনুযায়ী জিহাদ প্রধানত দুটি বিস্তৃত ক্ষেত্রে বিভক্ত: 'জিহাদুন-নাফস' (আত্মার বা ভেতরের জিহাদ) এবং 'বাহ্যিক জিহাদ' (পরিবেশগত বা প্রতিরক্ষামূলক সংগ্রাম)। থিসিসের মূল যুক্তি ছিল যে, ইসলামি পন্ডিত ও ধর্মতাত্ত্বিকদের সর্বসম্মত মতামতে, জিহাদুন-নাফস বা নিজের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ। এর বিপরীতে, 'কিতাল' বা সশস্ত্র যুদ্ধ হলো জিহাদের একটি বিশেষ ও সীমিত রূপ, যা কেবল সুনির্দিষ্ট নৈতিক, আইনি ও কৌশলগত শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত।

এই থিসিসে আমরা প্রমাণ করেছি যে, জিহাদের এই বহুমুখী ও নৈতিক ভিত্তি থাকা সত্ত্বেও, আধুনিক যুগে এটিকে প্রায়শই ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়। গণমাধ্যম এবং বিশেষত কিছু উগ্রবাদী গোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত অপপ্রচার জিহাদকে 'পবিত্র যুদ্ধ' (Holy War) নামক একটি পশ্চিমা ধারণার সমার্থক করে তুলেছে, যা ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত। এই অপপ্রচারের ফলে বিশ্বজুড়ে মুসলিম সম্প্রদায়কে ভুল বোঝা হচ্ছে এবং ইসলাম সম্পর্কে একটি বিকৃত ধারণা তৈরি হয়েছে।

অপপ্রচারের কারণ বিশ্লেষণ এবং প্রভাব

গবেষণায় দেখা গেছে যে জিহাদ সম্পর্কিত অপপ্রচারের মূলে রয়েছে ধর্মীয় গ্রন্থের আংশিক ও প্রসঙ্গ-বিচ্ছিন্ন (decontextualized) ব্যাখ্যা এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যবহার। কিছু সন্ত্রাসী সংগঠন নিজেদের সহিংস কার্যক্রমকে বৈধতা দিতে জিহাদ শব্দটিকে একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে, যা ইসলামের শান্তি ও ন্যায়বিচারের আদর্শকে ক্ষুণ্ন করে।

এই অপপ্রচারের সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। এটি ইসলামোফোবিয়া (Islamophobia) বা ইসলামভীতির জন্ম দিয়েছে, যা মুসলিমদের প্রতি বৈষম্য এবং ঘৃণা বৃদ্ধিতে ইন্ধন যোগায়। উপরন্তু, এই বিকৃত ব্যাখ্যা অনেক তরুণ-তরুণীকে ভুল পথে পরিচালিত করছে, যারা জিহাদের প্রকৃত অর্থ না বুঝে উগ্রবাদের দিকে ঝুঁকছে। থিসিসে আমরা জোর দিয়েছি যে, জিহাদের প্রকৃত অর্থ হলো অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো, নিরপরাধ মানুষের জীবনহানি ঘটানো নয়। ইসলামে নিরপরাধ মানুষ হত্যা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এবং এটি জিহাদ হিসেবে গণ্য হতে পারে না।

বস্তুত, জিহাদের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো একটি গঠনমূলক ও নৈতিক সংগ্রাম, যার লক্ষ্য হলো সমাজে শান্তি, ন্যায় এবং আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলা। এটি কেবল তখনই সশস্ত্র রূপ নেয় যখন সকল শান্তিপূর্ণ উপায় ব্যর্থ হয় এবং আত্মরক্ষা বা চরম নিপীড়িতদের রক্ষার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাও কঠোর নিয়ম মেনে।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা, ভবিষ্যত নির্দেশনা এবং সুপারিশ

এই গবেষণাটি জিহাদের অপপ্রচার এবং ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটি বিশ্লেষণাত্মক সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেছে। তবে, এই গবেষণার কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে; যেমন, এটি প্রধানত প্রচলিত ইসলামিক ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এবং আধুনিক গণমাধ্যমের বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল। ভবিষ্যতে আরও গভীর গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে, যা জিহাদ সম্পর্কিত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, বিভিন্ন মাযহাবের (চিন্তাধারা) ব্যাখ্যা এবং সমসাময়িক আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এর প্রভাব আরও বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখবে।

এই থিসিসের ফলাফলের ভিত্তিতে কিছু সুপারিশ করা যেতে পারে:

- **শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ:** জিহাদের প্রকৃত ও নৈতিক ধারণা সম্পর্কে সঠিক শিক্ষা এবং সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।
- **গণমাধ্যম:** সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে জিহাদ শব্দটি ব্যবহারে অধিকতর দায়িত্বশীলতা এবং সংবেদনশীলতা প্রদর্শন করা উচিত, যাতে ভুল ধারণা ছড়ানো বন্ধ হয়।
- **নীতি নির্ধারকগণ:** উগ্রবাদ দমনে কেবল সামরিক শক্তি প্রয়োগ না করে, এর মূল কারণ, বিশেষ করে অপব্যাখ্যা ও ভুল ধারণার বিরুদ্ধে সামাজিক ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা জরুরি।

উপসংহারে, জিহাদকে তার প্রকৃত ইসলামিক প্রেক্ষাপটে বোঝা অপরিহার্য। এটি যুদ্ধংদেহী মনোভাব নয়, বরং নিজের ভেতরের ও বাইরের সব ধরনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক নিরন্তর প্রচেষ্টা। এই গবেষণার লক্ষ্য হলো জিহাদ সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণা দূর করে ইসলামের ন্যায়পরায়ণ ও শান্তিমুখী শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

রেফারেন্সঃ

১. আবু হানীফা নুমান ইবনু সাবিত (১৫০হি.), আল-ফিকহুল আকবার, মুল্লা কারীর শারহ সহ, (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪)

২. শাফিয়ী, মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস (২০৪হি) আল-উম্ম (বৈরুত, দারুল মারিফাহ, ১৩৯৩ হি)

৩. আব্দুর রায্যাক সানআনী (২১১ হি), তাফসীরুল কুরআন (আল-মাকতাবুতশ শামিলা, ৩.৫ (www.sonnhonline.com)

৪. ইবনু আবী শাইবা, আবূ বাকর (২৩৫হি), আল-মুসান্নাফ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫)

৫. আহমদ ইবনু হাম্বাল (২৪১হি), আল-মুসনাদ (কাইরো, কুরতুবাহ, ও মা'আরিফ, ১৯৫৮)

৬. দারিমী, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রাহমান (২৫৫ হি.), আস-সুনান (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা,

৩.৫: http://www.islamiccouncil.com)
৭. বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (২৫৬হি), আস-সহীহ (বৈরুত, দারু কাসীর, ইয়ামাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৭)
৮. বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর (বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর)
৯. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (২৬১হি), আস-সহীহ (কাইরো, এহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যা)
১০. আবূ দাউদ, সুলাইমান ইবনু আশ'আস (২৭৫হি), আস-সুনান (বৈরুত, দারুল ফিকর)
১১. ইবনু মাজাহ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ (২৭৫ হি.), আস-সুনান (বৈরুত, দারুল ফিকর)
১২. তিরমিযী, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা (২৭৯ হি), আস-সুনান (বৈরুত, দারু এহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী)
১৩. মুবার্রিদ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ (২৮৫হি), আল-কামিল (বৈরুত, মুআস্সাসাতুর রিসাল্লাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৩)
১৪. নাসাঈ, আহমদ ইবনু শু'আইব (৩০৪হি), আস-সুনানুল কুবরা (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯১)
১৫. তাবারী, আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনু জারীর (৩১০ হি), তাফসীর: জামিউল বায়ান (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৪০৫ হি)
১৬. আবু আওয়ানা, ইয়াকূব ইবনু ইসহাক (৩১৬), আল-মুসনাদ (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৮)
১৭. আবু জা'ফর তাহাবী, আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ (৩২১হি.), আল-আকীদা আত-তাহাবীয়্যাহ, ইবনে আবীল ইজ্জ হানাফীর শারহ সহ, (বৈরুত, আলমাকতাবুল ইসলামী, ৯ম. ১৯৮৮)
১৮. আবূ জাফর তাহাবী, মাতনুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, (কাইরো, মাকতাবাতু ইবনি তাইমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৮)
১৯. ইবনু হিববান, মুহাম্মাদ আল-বুসতি (৩৫৪হি), আস-সহীহ (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসাল্লাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৩)
২০. আল-আজুর্রী, মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন (৩৬০হি), আশ-শারী'আহ (রিয়াদ, মাকতাবাতু দারিস সালাম, ১ম মুদ্রণ ১৯৯২)
২১. হাকিম নাইসাপূরী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ (৪০৫হি), আল-মুসতাদরাক (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০)
২২. বাগদাদী, আব্দুল কাহির ইবনু তাহির (৪২৯ হি), আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক (বৈরুত, দারুল মারিফাহ)
২৩. দানী, আবূ আমর উসমান ইবনু সাঈদ (৪৪৪ হি), আস-সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান (রিয়াদ, দারুল আসিমা, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৬ হি)

২৪. ইবনু হাযম, আলী ইবনু আহমদ (৪৫৬হি), আল-মুহাল্লা (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ)
২৫. ৪৫৮ বাইহাকী, আহমাদ ইবনুল হুসাইন (৪৫৮ হি), আস-সুনানুল কুবরা (মাক্কা মুকাররামা, মাকতাবাতু দারিল বায, ১৯৯৪)
২৬. ৪৫৮ বাইহাকী, আহমাদ ইবনুল হুসাইন (৪৫৮ হি), শু'আবুল ঈমান, (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০)
২৭. সারাখসী, আবু বাকর, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ (৪৯০ হি.), আল-মাবসূত (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ১৯৮৯)
২৮. রাগিব ইসপাহানী (৫০৭হি), আল-মুফরাদাত ফী গারিবিল কুরআন (বৈরুত. দারুল মারিফাহ, তা. বি.)
২৯. কাসানী, আলাউদ্দীন (৫৮৭হি) বাদাইউস সানাইয় (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)
৩০. ইবনুল জাওযী, আবুল ফারাজ আব্দুর রাহমান ইবনু আলী (৫৯৭ হি), তালবীসু ইবলিস (বৈরুত, দারুল ফিক্র, ১৯৯৪)
৩১. ইবনুল জাওযী, যাদুল মাসীর (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা ৩.৫: www.altafsir.com)
৩২. ইবনুল আসীর, মুহাম্মাদ ইবনুল মুবারাক (৬০৬ হি), আন-নিহাইয়াহ ফী গারিবিল হাদীস (বৈরত, দারুল ফিকর)
৩৩. আল-আমিদী, আলী ইবনু মুহাম্মাদ (৬৩১ হি), আল-ইহকাম (বৈরুত, দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১ম মুদ্রণ, ১৪০৪)
৩৪. আল-মাকদিসী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহিদ (৬৪৩ হি), আল-আহাদীসুল মুখতারাহ (মক্কা মুকাররামা, মাকতাবাতুন নাহদাহ আল-হাদীসাহ, ১ম, ১৪১০ হি)
৩৫. মুনযিরী, আব্দুল আযীম ইবনু আব্দুল কাবী (৬৫৬ হি), আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (বৈরুত, দারুল কুতুবলি ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭হি)
৩৬. ইয্য (আব্দুল আযীয) ইবনু আব্দুস সালাম (৬৬০হি), তাফসীরুল ইয্য (বৈরুত, দারু ইবন হাযম, ১ম প্রকাশ ১৯৯৬)
৩৭. রাযী, মুহাম্মাদ ইবনু আবী বাকর (৬৬৬ হি), মুখতারুস সিহাহ (বৈরুত, মাকতাবাতু লুবনান, ১৯৯৫)
৩৮. কুরতুবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ (৬৭১ হি), আল-জামি লি আহকামিল কুরআন (কাইরো, দারুশ শা'ব, ২য় প্র.)
৩৯. নববী, ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ (৬৭৬ হি.), শারহু সহীহ মুসলিম, (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৮১খ্রি.)
৪০. ইবনু তাইমিয়া, আহমদ ইবনু আব্দুল হালীম (৭২৮ হি) মাজমূউল ফাতাওয়া (রিয়াদ, দারুল ওয়াফা, ৩য় মুদ্রণ, ২০০৫)

৪১. আবূ হাইয়ান মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ (৭৪৫ হি), আল-বাহরুল মুহীত (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ৩.৫: http://www.altafsir.com)
৪২. যাহাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ (৭৪৮ হি.) সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসাল্লাহ, ৯ম মুদ্রণ, ১৪১৩ হি)
৪৩. ইবনু কাসীর ইসমাঈল ইবনু উমার (৭৭৪ হি), আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৬)
৪৪. ইবনু কাসীর, আন-নিহায়াতু ফিল ফিতানি ওয়াল মালাহিম (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ৩.৫: http://www.alwarraq.com)
৪৫. ইবনু কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (মদীনা, দারু তাইবা, ২য় প্র. ১৯৯৯)
৪৬. শাতিবী, ইবরাহীম ইবনু মূসা (৭৯০ হি), আল-ই'তিসাম (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ১৯৮৫)
৪৭. ইবনু আবিল ইজ্জ হানাফী (৭৯২হি), শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ (বৈরুত, আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ৯ম প্র., ১৯৮৮)
৪৮. ইবনু রাজাব, আব্দুর রাহমান ইবনু আহমাদ (৭৯৫ হি.), জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম (বৈরুত, দারুল মারিফাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮হি)
৪৯. হাইসামী, নূরুদ্দীন আলী ইবনু আবী বাকর (৮০৭হি.) মাজমাউয যাওয়াইদ (বৈরুত, দারুল কিতাবিল আরাবী, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮২)
৫০. ফিরোযআবাদী, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াকূব (৮১৭হি) তানবীরুল মিকবাস (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা ৩.৫: http://www.altafsir.com)
৫১. বূসীরী, আহমদ ইবনু আবী বাকর (৮৪০ হি), মিসবাহুয যুজাজাহ (বৈরুত, দারুল ম'রিফাহ, ২য় প্রকাশ, ১৪০৩ হি)
৫২. ইবনু হাজার আসকালানী, আহমদ ইবনু আলী (৮৫২ হি) ফাতহুল বারী শারহু সাহীহিল বুখারী (বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর)
৫৩. সানআনী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (৮৫২ হি), সুবুলুস সালাম (বৈরুত, দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৩৭৯ হি)
৫৪. আব্দুর রাহমান ইবনু আবী বাক্র সালিহী (৮৫৬হি), আল-কান্যুল আকবার (মাক্কা মুকার্রামা, মাকতাবাতু নিযার বায, ১ম মুদ্রণ, ১৯৯৭)
৫৫. সুয়ূতী, জালালুদ্দীন (৯১১) যাইলুল মাউযূআত (ভারত, আল-মাতবাউল আলাবী, ১৩০৩ হি)
৫৬. মোল্লা আলী কারী (১০১৪হি), আল মাসনু' (হালব, সিরিয়া, মাকতাব আল-মাতবু'আত আল-ইসলামিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৬৯)
৫৭. মুনাবী, আব্দুর রাউফ (১০৩১ হি), ফাইদুল কাদীর (কাইরো, আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়া আল-কুবরা, ১ম মুদ্রণ, ১৩৫৬ হি)

৫৮. যারকানী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল বাকী (১১২২হি), শারহুল মুয়াত্তা (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪১১)

৫৯. ইবনু আজীবাহ, আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ (১২২৪), আল-বাহরুল মাদীদ (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ৩.৫: http://www.altafsir.com)

৬০. শাওকানী, মুহাম্মাদ ইবনু আলী (১২৫৫ হি.) নাইলুল আউতার, (বৈরুত, দারুল জীল, ১৯৭৩)

৬১. ইবনু আবেদীন, মুহাম্মাদ আমীন (১২৫৬ হি), রাদ্দিল মুহতার (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৭৯)

৬২. রাহমাতুল্লাহ ইবনু খলীলুর রহমান কীরানবী (১৩০৮ হি), ইযহারুল হক্ক, ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর অনূদিত (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ২০০৭)

৬৩. আযীমআবাদী, মুহাম্মাদ শামসুল হক্ক (১৩১০হি), আওনুল মা'বুদ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় মুদ্রণ, ১৪১৫হি)

৬৪. মুবারকপুরী, মুহাম্মাদ আব্দুর রাহমান (১৩৫৩হি), তুহফাতুল আহওয়াযী (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)

৬৫. আব্দুর রাহমান ইবনু মুহাম্মাদ আল-হাম্বালী (১৩৯২ হি); হাশিয়তুর রাওদিল মুরবি' শরাহু যাদিল মুসতানকী (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ৩.৫: http://www.ahlalhdeeth.com)

৬৬. আবুল হাসান আলী নদবী (১৪২০ হি), রিজালুল ফিকরি ওয়াদ দাওয়াত (সিরিয়া, দার ইবন কাসীর, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৯)

৬৭. আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন (১৪২০), সহীহুল জামিয়িস সাগীর (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৮)

৬৮. আলবানী, সহীহুত তারগীব (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ৩য মুদ্রণ, ১৯৮৮)

৬৯. আলবানী, যয়ীফু সুনানি ইবনি মাজাহ (সৌদি আরব, রিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭)

৭০. আলবানী, সহীহু সুনানি ইবনি মাজাহ (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭)

৭১. আলবানী, সিলসিলাতুল- যায়ীফাহ (রিয়াদ, মা'আরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২)

৭২. আলবানী, সিলসিলাতুল- সাহীহাহ (রিয়াদ, মা'আরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২)

৭৩. আলবানী, ইরওয়াউল গালীল (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম, ১৯৭৯)

৭৪. আলবানী, সহীহু সুনানিত তিরমিযী (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ৩.৫)

৭৫. মতিওর রহমান, ঐতিহাসিক অভিধান (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৭)

৭৬. উসাইমীন, মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ, আল-কাওলুল মুফীদ (রিয়াদ, দারু ইবনুল জাওযী, ২য় প্রকাশ, ১৪২৪ হি)

৭৭. মুহাম্মাদ সুরূর বিন নাইফ, আল-হুকমু বিগাইরি মা আনযালাল¬াহু ও আহলুল গুলূ, (ব্রিটেন, বার্মিংহাম, দারুল আরকাম, ২য় প্রকাশ)

৭৮. গোলাম আহমদ মোর্তাজা; চেপে রাখা ইতিহাস (বর্ধমান, ভারত, ৮ম, ২০০০)
৭৯. গোলাম আহমদ মোর্তাজা; ইতিহাসের ইতিহাস (বর্ধমান, বিশ্ব-বঙ্গীয় প্রকাশন, ১৯৭৮)
৮০. আজহারুল ইসলাম, এ.কে.এম, নিন্দিত বিশ্ব নন্দিত গন্তব্য (চট্টগ্রাম, আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন,২০০৭)
৮১. সালিহ আল-শাইখ, শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিতিয়্যাহ (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ৩.৫)
৮২. ড. আহমদ মুহাম্মাদ জলী, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক (রিয়াদ, কিং ফায়সাল ফাউন্ডেশন ফর রিসার্চ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ, ২য় মুদ্রণ ১৯৮৮)
৮৩. ড. ইবরাহীম জুমআ, আল-আতলাস আত-তারীখী লিদ-দাওলা আস-সাঊদিয়্যাহ (রিয়াদ, দারাতুল মালিক আব্দুল আযীয, ১৯৭৯)
৮৪. ইসমাঈল আহমদ ইয়াগী, তারীখুল আলাম আল-ইসলামী (রিয়াদ, মিরীখ, ১৯৯৩)
৮৫. ড. নাসির আল-আকল, আল-খাওয়ারিজ (রিয়াদ, দারুল ওয়াতান, ২য় প্রকাশ, ১৪১৭)
৮৬. শ্রী শৈলেন্দ বিশ্বাস, সংসদ বাংলা-ইংরেজি অভিধান (কলকাতা, শিশু সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৯)
৮৭. সালিম বাহনসাবী, আল-হুকমু ওয়া কাদিয়্যাতু তাকফীরিল মুসলিম (কুয়েত, দারুল বুহূসিল ইলমিয়্যাহ, ৩য় মুদ্রণ, ১৯৮৫)
৮৮. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার দুমাইজী, আল-ইমামাতুল উযমা (রিয়াদ, দারু তাইবা, ২য় মুদ্রণ, ১৪০৯ হি)
৮৯. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ ২০০৭)
৯০. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, এহইয়াউস সুনান (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ৫ম সংস্করণ ২০০৭)
৯১. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, বুহূসুন ফী উলূমিল হাদীস (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ ২০০৭)
৯২. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ৩য় প্রকাশ ২০০৮)
৯৩. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, আল্লাহর পথে দাওয়াত (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২য় সংস্করণ ২০০৯)
৯৪. সম্পাদনা পরিষদ, আল-মাওসূআ আল-ফিকহিয়্যাহ: আল-ফিকহ বিশ্বকোষ (কুয়েত আওকাফ ও ইসলামিক এফেয়্যার্স মন্ত্রণালয় ও দারুস সালাসিল, ২য় মুদ্রণ, ১৪২৭হি)
৯৫. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)

৯৬. The Holy Bible, Authorized Version/King James Version, reprinted and published by Bible Society of South Africa, 1988.
৯৭. quoted from Dr. Abdul Hamid Qadri, Dimensions of Christianity, (Islamabad, Pakistan, Da’wah Academy, International Islamic University, 1st edition, 1989)
৯৮. Carl Gottaleb Pfander, Balance of Truth (The Mizanul Haqq), part-1 (The Good Way, Rikon, Switzerland)
৯৯. Encyclopaedia Britannica, CD Version, 2005
১০০. The Independent, Dhaka 14/1/2006. 18/02/2006, 8/9/2006, 20/02/2009
১০১. A. S. Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary (Oxford University Press, 5th edition, 1995)
১০২. Ahmed Deedat, The Choice (Jeddah, Abul Qasim Publications, 1st, 1994)
১০৩. Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation.